নব্যভারত

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী সম্পাদিত।

ত্রিংশ খণ্ড—১৩১৯।

কলিকাতা,

২১০।৪ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, নব্যভারত-কার্য্যালয় হইতে

সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও

২১০।৫ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, নব্যভারত-প্রেসে, শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য অগ্রিম বাঁধা তিন টাকা, বাঁধা ৩৷৷০।

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	অদৃষ্ট। (সম্পাদক)	১
২।	[illegible] (পদ্য) (শ্রীবীরকুমার-বধ রচয়িত্রী) ...	৩২
৩।	আত্তিম্ অমর (গল্প) (শ্রীউমেশচন্দ্র বসুমজুমদার)	৪১১
৪।	অনুবর্ত্তন। (সম্পাদক)	১১৪
৫।	অবন্ধন ও রাখীবন্ধন। (শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়)	৪৯০
৬।	অন্ধকারের প্রতি। (পদ্য) (শ্রীমতী অনঙ্গমোহিনী দেবী) ...	৫২৩
৭।	অতুল বাবুর পত্রোত্তর। (শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়)	৫৪৬
৮।	আমাদের দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থা। (শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়) ...	৪৩
৯।	আসল মানুষ। (পদ্য) (শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস)	১৬৬
১০।	আমাদের জাতীয় উন্নতি কিসে হইবে? (শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়)	১৮৬
১১।	আমুষ্মিক। (পদ্য) (শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী)	৩৫১
১২।	আদিশূরের রাজধানী গৌড় কি বিক্রমপুর? (শ্রীবরদাকান্ত সেন গুপ্ত) ...	৪১৩
১৩।	আচার্য্য কেশবচন্দ্রের জন্মদিন। (পদ্য) (শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়)	৫৪৯
১৪।	আদিশূরের রাজধানী গৌড় কি বিক্রমপুর? (শ্রীমোহিনীমোহন বসু, বি-এ,)	৬২০
১৫।	আমার নূতন সৃষ্টি। (শ্রীমনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা) ...	৬৩৬
১৬।	আহিতাগ্নি আর্ট। (শ্রীযামিনীকান্ত সেন, বি-এল,) ...	৬৯০
১৭।	ইতিহাসে কবিত্ব। (শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ, বি-এ) ...	১২৪
১৮।	উত্তর বঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলন। (শ্রীভবানীগোবিন্দ চৌধুরী, বি-এল,) ...	১৩
১৯।	উভয় রামকৃষ্ণের তুলনা। (শ্রীবসন্ত কুমার রায়, এম-এ, বি-এল)	১০০, ৫১৭ ও ৫৯৮
২০।	একটী প্রশ্ন। (শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়) ...	৭৫৩
২১।	একটী নিবেদন। (শ্রীচন্দ্রশেখর সেন, Bar-at-law) ..	৬
২২।	কৃতঘ্নতা। (সম্পাদক)	১৬২
২৩।	কাশীবাস। (শ্রীরসিকলাল রায়) ...	২৯১, ৩৭৫ ও ৫৩০
২৪।	কলেরার উত্তেজক। (শ্রীঅম্বিকাচরণ মজুমদার, এল-এম-এস) ...	৫৫৬
২৫।	কেশব ও রামকৃষ্ণ। (শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত, এল-এম-এস) ...	৫৫৯
২৬।	কেশব ও রামকৃষ্ণ—প্রতিবাদ (১) (শ্রীআশুতোষ চক্রবর্ত্তী) ...	৬০৬
২৭।	ঐ ঐ (শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এল-এম-এস)	৬০৮
২৮।	কায়স্থ-উদ্বোধন। (শ্রীবরদাচরণ মিত্র, এম্-এ, সি-এস) ...	৫৯৮
২৯।	কৈবল্য। (সম্পাদক)	৬৯৬
৩০।	গবর্ণমেণ্ট-পদের-অনুসন্ধান-সমিতি। (শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত, এল-এম-এস)	৭৪৫
৩১।	চেন্নপট্টন। (শ্রীদুর্গাচরণ রক্ষিত)	৫৪, ১৮৮
৩২।	জাপান ও ভারতের সম্বন্ধ। (শ্রীপ্রমদাকুমার বিশ্বাস, Ph D) ...	৩৫২
৩৩।	জন্মান্তর ও কর্ম্ম। (শ্রীযোগেন্দ্রকুমার ঘোষ, এম-এ) ...	৪৬২
৩৪।	জীবনের সুখ দুঃখ। (শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ, এম-এ, বি-এল) ...	৬৫
৩৫।	জ্ঞান ও অবিদ্যা। (শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায়চৌধুরী)	৭৫৭
৩৬।	ঠাকুর কাশীনাথ। (শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ, বি এল) ...	৩২৯
৩৭।	তপোবন। (শ্রীআনন্দগোপাল ঘোষ)	৬৫১
৩৮।	তেরশে আশ্বিন। (সম্পাদক)	৪৮৩
৩৯।	দল। (শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত, এল-এম-এস) ...	১৫৫
৪০।	দুর্গা পূজা। (শ্রীঅনঙ্গমোহন চৌধুরী)	৩৫৮
৪১।	দাসীর স্নেহ। (পদ্য) (শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ, বি-এল) ...	
৪২।	দুর্গোৎসব ঐ (শ্রীবীরকুমার-বধ-রচয়িত্রী) ..	৫ ৩
৪৩।	দুর্গা-পূজা। (পদ্য) (শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস)	৩৯৩
৪৪।	দেবদূত। (শ্রীগণেশচন্দ্র [illegible]গুপ্ত, এম-এ, বি-এল) ..	৩৯০

মানবের ভ্রাতৃপ্রেম। (শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়) ... ২৯৯
৯১। মানব-জীবনের দুঃখ-সমস্যা। (শ্রীশরচ্চন্দ্র রায়, বি-এ) ... ৪৪৯
৯২। মায়ের কাছে আয় আবার। (শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়, এম-এ, বি-এল) ৬৩৪
৯৩। ম্যালেরিয়া রোগের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। (শ্রীঅম্বিকাচরণ মজুমদার, এল-এম-এস) ১৬৭
৯৪। মেঘনাদ-বধ কাব্য। (শ্রীদয়ালচন্দ্র ঘোষ) ... ১৮০
৯৫। যুক্তি, অযুক্তি ও কুযুক্তি। (শ্রীরসিকলাল রায়) ... ৪৮
৯৬। যুক্তি-জঞ্জাল। (শ্রীরসিকলাল রায়) ... ৮৯
৯৭। যুগ বিপ্লব। (শ্রীরসিকলাল রায়) ... ৬৪০
৯৮। রামচন্দ্র—উত্তররামচরিত। (শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী) ... ১৯৩
৯৯। রামমোহন রায়ের বিশ্বদৌত্য। (শ্রীশরৎচন্দ্র বাগচী) ... ২৮৫
১০০। রামমোহন রায়ের সংস্কার-প্রণালী। (শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম-এ) ... ৪০৩
১০১। রাজনীতি ও সাহিত্য। (শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়, এম-এ) ... ৬৪৫
১০২। রাজা বিক্রমাদিত্য। (শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন, এম-এ) ৬৫৭ ও ৭১৫
১০৩। লুপ্তোদ্ধার। (শ্রীনকুড়চন্দ্র বিশ্বাস) ... ১৭৫
১০৪। লোকশিক্ষা। (শ্রীশশধর রায়, এম-এ, বি-এল) ... ২৫৭
১০৫। ৺হরকুমার কাব্যতীর্থ সিদ্ধান্তভূষণ (জনৈক সহযোগী) ... ৫৯
১০৬। হিন্দু সমাজ। (শ্রীকুমুদনাথ লাহিড়ী) ... ২৯৪
১০৭। হিন্দু নাম। (শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি-এল) ... ৫২৪
১০৮। হেমন্তে। (পদ্য) (শ্রীরসময় লাহা) ... ৫০৬
১০৯। শঙ্কর দর্শন। (শ্রীদ্বিজদাস দত্ত, এম-এ) ... ৭২৩
১১০। শরত-প্রভাতে। (পদ্য) (শ্রীদেবকুমার রায়-চৌধুরী) ... ৪৫৩
১১১। শিশু-সৌন্দর্য্য। (পদ্য) (শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী) ... ১১২
১১২। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণজন্মোৎসব। (শ্রীউপেন্দ্রমোহন চৌধুরী কবিভূষণ) ... ৩৬৫
১১৩। সপ্তলোক-তত্ত্ব। (শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিদ্যানিধি, এম-এ) ... ৬৪৮
১১৪। সময়ের ফের। (শ্রীবসিকলাল রায়) ৬৭৬
১১৫। সাধারণ জ্ঞান ও বিজ্ঞান। (শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য) ... ৩৯৯
১১৬। সাংখ্য-সূত্র। (শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু, এম-এ, বি-এল) ২০৫, ৪১৯, ৬২৩
১১৭। স্বপ্ন-তত্ত্ব। (শ্রীসরসীলাল সরকার এম-এ, এল-এম-এস) ১৫, ২২৮
১১৮। সিদ্ধকাঠীর সালিসী। (সম্পাদক) ৭২০
১১৯। সুয়া চুয়া। (পদ্য) (শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস) ২৮৪
১২০। স্বদেশী-তত্ত্ব। (শ্রীচাবুকরাম চৌবে) ৩২১
১২১। স্বদেশিতত্ত্ব—প্রতিবাদ। (শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সান্ন্যাল) ... ৫
১২২। স্বর্গীয় কালীবর। (শ্রীআনন্দগোপাল ঘোষ) ... ৩৪৭
১২৩। স্বদেশী তত্ত্ব। (মুন্সি দিল্লগীরাম শ্রীবাস্তব্য) ... ৫৪৬
১২৪। "স্বধর্ম্ম"। (সমালোচনা) (শ্রীশৈলেশচন্দ্রনাথ বিদ্যাবিনোদ, বি-এ)
১২৫। স্বাদেশিকতা। (শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সান্ন্যাল)
১২৬। স্বাভাবিক যোগ। (শ্রীকমলাকান্ত ব্রহ্মদাস)
১২৭। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা। (শ্রীপদ্মরত্ন ঘোষাল, এম-এ শ্রীআনন্দগো
শ্রীরমণীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহেমচ
শ্রীমতী সরযূবালা সেনগুপ্তা, শ্রীমতী [illegible]রদবরণী দেবী, শ্রীল
, এম-এ, বি-এল, শ্রীক
[illegible]

৪৫। ধর্ম্মবীর ভগীরথ। (শ্রীনকুড়চন্দ্র বিশ্বাস)
৪৬। ধর্ম্মের সঙ্গে সামাজি ও রাজনৈতিক উন্নতির সম্বন্ধ। (শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়) ৬১৩
৪৭। নববর্ষ (পদ্য) (শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস) ১৯
৪৮। নাসিক। (শ্রীকুঞ্জলাল দাস) .. . ৪৯৫
৪৯। নিবেদন। (শ্রীনিস্তারিণী ঘোষ) ৩৫৮
৫০। নীরব সাহিত্য-সেবক। (সম্পাদক) ৫৬৯
৫১। শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট পত্র। (শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়) ৮২,২৫৪,৩০৭,৩৭৯
৫২। পরলোকবাসী ব্রাহ্ম,মুসলমান ও মুসলমান ধর্ম্ম। (শ্রীআমানতউল্লা আহম্মদ) ৫০৭
৫৩। পঞ্চশত। (পদ্য) (শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত, এল-এম-এস) ... ৫৮৬
৫৪। বিশ্বস্তর জ্যোতির্ম্মার্ণব। (শ্রীযোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) ... ৫৮৬
৫৫। প্রসাদী ফুল। (শ্রীমনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা) ২০,৭৭,৩৬২,৪৫৬,৫১৩,৭০৯
৫৬। প্রতিবাদ। (শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,এম-এ, বি-এল) . ২৫৩
৫৭। প্রত্যাখ্যাত প্রবন্ধ। (শ্রীমনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা) ... ২১৯
৫৮। প্রকট প্রেম বা জেনাবেল বুথ। (সম্পাদক) ৩১৪
৬৯। প্রকৃত ভজন-তত্ত্ব। (শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়) .. ৬৮৭
৬০। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। ৬৩,১৯১,২৫৬,৩২০,৪৪০,৫১১,৫৭৬,৬৪৪, ৭০৫,৭৬৭
৬১। প্রেম-শিশু। (পদ্য) (শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল) ... ৪৯
৬২। বসুমতীর ব্যবহার। (শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য, এম-এ) ... ৯
৬৩। বর্ষা। (পদ্য) (শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি-এল) ... ১২৪
৬৪। বর্ষা-সঙ্গীত। (পদ্য) (শ্রীবিভাবতী সেনগুপ্তা ও শ্রীনীলবতন মুখোপাধ্যায়) ২৫৪
৬৫। বঙ্গসাহিত্য। (শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বসু) ৩১৭
৬৬। বর্ণ-তত্ত্ব। (শ্রীশশধর রায়, এম-এ,বি-এল) ৩৪১, ৫২৮, ৬৩০, ৬৬০ ও ৭১৭
৬৭। বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমানগণের প্রতি নিবেদন। (শ্রীললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়) ৭৬০
৬৮। বাসনা-বিজয় (শ্রীকাশীচন্দ্র ঘোষাল) ১৮০
৬৯। বায়ু পিত্তের দ্বন্দ্ব, না আত্মপ্রচার? (শ্রীঅতুলচন্দ্র রায়, এল-এম্-এস) ৩৯৪
৭০। বিজয়া। (শ্রীবসিকলাল রায়) ৪৫৩
৭১। "বিথলঙ্গের আথবার" প্রতিবাদ। (শ্রীমুকুন্দলাল বসু) ... ৫২
৭২। ব্রহ্মপুত্র। (পদ্য) (শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী) ... ২৫২
৭৩। ব্রহ্মবিদ্যা। (শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সিংহ, বি-এ) ... ২৫৪, ২৬২
৭৪। ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ। (শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়) ... ২৮
৭৫। বৈশাখী। (পদ্য) (শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী) ... ৩৭
৭৬। ব্রাহ্মসমাজ, ভারত ও জগতের উন্নতি। (শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়) ... ৪২৯
৭৭। বৈষ্ণব প্রবন্ধের পরিশিষ্ট। (শ্রীতারিণীচরণ চক্রবর্ত্তী সরস্বতী) ... ৩৬৯
৭৮। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে গোস্বামী মহাশয়। (শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়) ৬১৩
শ্রীকৃষ্ণলাল সাহা) ৬৬৫
(শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস) ৬৯৪
। (শ্রীদ্বিজদাস দত্ত, এম-এ) ৫৩৭
জকৃষ্ণ পাল) ৫০৪
ড়া-গোস্বামী। (শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল) ... ২৭৪
ম। (শ্রীপ্যারীশঙ্কর গুপ্ত, এল-এম-এস ২৯৭
(পদ্য) (শ্রীবিজয়লাল দ
ীরক

নব্যভারত

ত্রিংশ খণ্ড—১৩১৯।

অ-দৃষ্ট।

"However, as we Know in India, no one can avoid his fate. It is only in that they think they can muzzle the Almighty with precautions."

The Indian Daily News, 29th April

যাহা দেখা যায় না, তাহা অদৃষ্ট। বিধাতার বিধান অলঙ্ঘ্য, অপরিহার্য্য, দুর্দ্ধর্ষ, দুরতিক্রমণীয়। জীবের মঙ্গলের জন্য শিবধামে প্রতিনিয়তই নববিধান রচিত হইতেছে, কিন্তু তাহা দুর্লক্ষ্য। সে বিধানে কখনও দুঃখ, কখনও সুখ; কখনও জীবন, কখনও মৃত্যু জীবের ভাগ্যে ঘটিতেছে। সে বিধান কখনও তিক্ত, কখনও মিষ্ট; কখনও বিষাদময়, কখনও শান্তিময়। যাহাই হউক, পরিণামে সে বিধানে জীবের মঙ্গলই সাধিত হইতেছে। জীব অদৃষ্ট-ভাবনায় সদা ম্রিয়মাণ!!

আজ যে সুখ আছে, কাল যে তাহা থাকিবে, তাহার কোনই নিশ্চয়তা নাই। পরন্তু আজ যে বিপদ সমুপস্থিত, কাল তাহা নাও থাকিতে পারে। সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ, প্রতিনিয়ত চক্রবৎ ঘুরিতেছে। এজগতে কোন অবস্থাই স্থায়ী নয়।

সুখ শান্তি কে না চায়? সকলেই চায়, কিন্তু সকলে তাহা সর্ব্বসময়ে পায় না। দুঃখ কষ্ট কে চায়, কেহই চায় না; কিন্তু সকলের ঘরেই দুঃখ কষ্ট আসিবে। বিধাতার দুর্লঙ্ঘ্য বিধান কে অতিক্রম করিতে পারে? বৈজ্ঞানিক মানুষ মনে করিত, টাইটানিক জাহাজ উন্নতি-যুগের আশ্চর্য্য সৃষ্টি, উহা বিনাশের অতীত। কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যে সব যেন ভেল্কি হইয়া গেল,—একটু আঘাত, আর সব চূর্ণীকৃত। কে ভাবিয়াছিল, টাইটানিকের পরিণাম এমন বিষাদময়? মানুষ যাহা কখনও ভাবিতে পারে নাই, ১৪ই এপ্রেল (১৯১২) তাহা ঘটিয়াছে। মানুষ তবুও কি মনে করিবে, বিজ্ঞান ভ্রান্তিময় নয়? মানুষের দম্ভ বিধাতৃশক্তির ফুৎকারে চূর্ণীকৃত। বিধাতা অমোঘ বিধান!!

ভারত-ইতিহাসে যাহা একালে ঘটিতেছে তাহা ভাবিয়া আমরা অবাক্ হইয়াছি। অবাক্ হইয়া শুধু ভাবিতেছি, কি ঘটিল, কি দেখিলাম!!

পার্টিসন আসিল, "স্বদেশী" জাগিল, আবার নব-পার্টিসন আসিল, আবার মানুষ ঘুমাইয়া পড়িল, "স্বদেশী" মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইল! জীবনকাঠি, মরণকাঠি কাহার হস্তে বলত? কর্জ্জনের হস্তেও নয়, হার্ডিংয়ের হস্তেও নয়; তাহা বিধাতার হাতে। কে ভাল, কে মন্দ, ভবিষ্যতে তাহার বিচার হইবে। তাঁহারা বলেন চেষ্টা; আমরা বলি, "নির্ভর" ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই। এ ভারত কি আর জাগিবে না? বিহার, উড়িষ্যা, আসাম বঙ্গ হইতে পৃথক্ হইয়া গেল, আবার কি এক হইবে [illegible] শ্রীহট্ট, কাছাড়, ছোটনাগপুর, [illegible] বঙ্গ হইতে বিভক্ত হইল, আবার [illegible] করিবে না? কালের অনন্ত

আরও লিখিতে পারি, এই, "চির দিন কখনও সমান যায় না। দুঃখের পরে সুখ, অশান্তির পরে শান্তি, নবজীবন, বিচ্ছেদের পর মিলন আসিবেই আসিবে। যতই তিক্ত হউক, উহা উদরসাৎ করিতেই হইবে। ইহা বলিয়া, ভয় বা ভাবনা কেন করিতে বলত?

হিন্দুত্ব ভারতে অবিনাশী। বৌদ্ধধর্ম্ম তাহা বিনাশ করিতে পারে নাই, কালে তাহা হিন্দু-কুক্ষিগত হইয়াছে; বহুদিনেও মুসলমান-ধর্ম্ম তাহা বিলোপ করিতে পারে নাই; খ্রীষ্ট-ধর্ম্মও তাহার অনিষ্ট করিতে পারে নাই। পরন্তু পৃথিবীর ঐ তিন সু-মহান ধর্ম্ম-সংঘর্ষে হিন্দু-ধর্ম্মের প্রভূত উপকার হইয়াছে—দিন দিন হিন্দুধর্ম্ম উন্নতি হইতে উন্নতির পথে চলিয়াছে। যে সকল অনাবিলতা হিন্দু ধর্ম্মে কাল ক্রমে স্থান পাইতেছিল, তাহা শোধিত হইয়া যাইতেছে, সঙ্কীর্ণতা দিন দিন তিরোহিত হইতেছে, উদারতা ও বিশ্ব-ব্যাপকতা হিন্দুর মজ্জাগত হইতেছে। বৈষ্ণব ধর্ম্মের সংস্কার, ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং আর্য্যধর্ম্মের উত্থান এবং পরমহংস রামকৃষ্ণ-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম-প্রভাবই আমাদের সিদ্ধান্তের জাজ্বল্যমান প্রমাণ। এই সকল ধর্ম্মই জাতি-নির্ব্বিশেষে সকলকে দীক্ষিত করিতেছে। যেরূপে, যে ভাবে, যে প্রণালীতেই হউক, একেশ্বরবাদের বিশালতা এখন হিন্দুত্বের মজ্জাগত হইয়া যাইতেছে। বিশ্ব-মানবের অভ্যুত্থান এ ভারতে অচিরে হইবে বলিয়া আশা হইতেছে।

এই হিন্দুত্বের ছায়া-তলে থাকিয়া নব্য-ভারত শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির পথে চলিতে [illegible] সে কথা বলিবে, যদি কেহ বিরক্ত হন [illegible] স্মরণ করিয়া উন্নতি প্রতিরোধ [illegible] না। সে জাগরণের কথায় যদি কাহারও গাত্র উপস্থিত হয়, তাহাতে ভারতের অবনতি হইবে না। যদি কখনও হয়, তবে তাহা ক্ষণিক মাত্র। হিন্দুত্ব যখন সার্ব্বভৌমিকত্বের বিশাল বিস্তৃতি পথে চলিতেছে, তখন ভাবনার কি আছে? এই ভারতে কত জাতির সমাবেশ; সকল জাতিই উন্নতিকামী হইতেছেন, সকলেই স্ব স্ব উন্নতির জন্য লালায়িত ও সচেষ্ট হইতেছেন। এ যুগের বিশেষত্বকে খর্ব্ব করিতে পারে, এমন লোকের অভ্যুদয় কদাপি সম্ভব নয়। তবে ভয় কিসের?

হিন্দুত্ব জাগাইয়া রাখিতেছে কে, তাহা জান কি? বিশুদ্ধ ভাষাই হিন্দুত্বের প্রাণ। সংস্কৃত ভাষা বিলুপ্ত না হইলে হিন্দুত্বের বিনাশ নাই। সংস্কৃত ভাষার উন্নতি-স্রোত রুদ্ধ হইতেছে বলিয়া কেহ কেহ আক্ষেপ করিয়া থাকেন। কিন্তু বাঙ্গালা, মহারাষ্ট্রীয়, হিন্দি, গুজরাটী, অসামীয়া ও উড়িয়া ভাষার যে শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতেছে, তাহাতেই কি মাতৃভাষা জাগরিত নয়? যে তাহা অস্বীকার করে, ভাষাতত্ত্ব সে জানে না। ল্যাটিন, গ্রিক ভাষাকে জাগাইয়া রাখিয়াছে, ইংরাজি ভাষা। সংস্কৃত ভাষাকেও জাগাইয়া রাখিবে, বাঙ্গালা এবং ভারতের অন্যান্য ভাষাসমূহ। সুতরাং এদিকে ভয়ের কিছুই নাই।

কেহ কেহ বলেন, প্রবল পাশ্চাত্য-সংঘর্ষ সম্মুখে—ঐ সংঘর্ষে ভারতীয় বিশেষত্ব অচিরে বিলুপ্ত হইবে; জাগিয়া উঠিবে কেবল খ্রীষ্টত্বের অপছায়ার বিকৃতি। খ্রীষ্টত্বকে তাঁহারা নিন্দনীয় মনে করেন না, কিন্তু সাংসারিকতা ও জড়বাদিতাকে তাঁহারা ভয় করেন। তাঁহারা আন্তরিকতাকে ভয় করেন না, কিন্তু বাহ্য-সর্ব্বস্বতাকে বড়ই ভয় করেন। খ্রীষ্টত্বের অপছায়ার অর্থ যদি কপটতা হয়, তবে তাহাকেই

তাঁহারা ভয় করেন। মুখে দয়ার কথা, কার্য্যে রক্তপাত ও কাটাকাটির কথায় যাঁহারা পোষকতা করেন, তাঁহাদের বিশেষত্বকে কে সাদরে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত? সুতরাং খ্রীষ্টের বিকৃত অপছায়াকে এ দেশের ষোল-আনা লোক ভয় করে। অনেকেরই ভয়, হিন্দুত্বের বিশেষত্ব কালে খ্রীষ্টত্বের বহির্বাসভবণের কালিমায় মলিন হইয়া যাইবে। ইহা যে বিশেষ চিন্তার বিষয়, তাহাতে কোনই সংশয় নাই। বিশেষতঃ প্রেমাচ্ছাদনে যেরূপে অত্যাচার, অবিচার মানুষকে ভুলাইয়া ফেলিতেছে, তাহা ভাবিলে ভবিষ্যতের চিন্তায় মুহ্যমান না হইয়া থাকা যায় না। কিন্তু বিধাতার বিধান অলঙ্ঘ্য। বহু শতাব্দী যে জীবিত রহিয়াছে, অপছায়া কিছুতেই সেই হিন্দুত্বের অনিষ্ট করিতে পারিবে না, মনে হয়। এক্ষেত্রেও নির্ভরই হিন্দুর প্রাণ।

ভয় পাশ্চাত্য সংঘর্ষের নয়, ভয় খ্রীষ্টত্বের অপছায়ায় উদ্ভূত আত্ম-সংঘর্ষের। আমরা যদি নির্ভর করিয়া ঠিক থাকিতে পারি, ভয়ের কিছুই নাই। তাঁহারা ত আমাদের অনিষ্টের চেষ্টা করিবেনই, তাহা কে না জানে? আমরা জাগিয়া উঠিলে তাঁহাদের স্বার্থ-সাধনে বাধা পড়িবেই। কে আপন স্বার্থ ভুলিয়া অন্যের উন্নতির চেষ্টা করে? আমরা যদি তাহা বুঝি, বুঝিয়া যদি আত্ম-কল্যাণ-নাশে সহায়তা না করি, জাতীয় একতা, ভাষার একতা, ধর্ম্মের একতা সাধনে যদি নিয়ত বদ্ধপরিকর থাকি,—আমরা যদি সযত্নে দরিদ্রদিগের উন্নতির চেষ্টা করি, আমরা যদি রোগীকে ঔষধ দিয়া ও দুর্ভিক্ষ-পীড়িতকে আহার দিয়া বাঁচাই, আমরা যদি প্রকট-নারায়ণ দিগকে রক্ষা করিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করি, কে আমাদিগকে বিনাশ করিতে পারে? ভয় শুধু পাশ্চাত্য সংঘর্ষের নয়, ভয় আমাদের আত্ম-সংঘর্ষের।

আত্ম-সংঘর্ষ,—হায়, হিংসা, বিদ্বেষ, কৃতঘ্নতা, পরশ্রীকাতরতা, জড়ধাদিতা বিমল শিক্ষায়ও এদেশ হইতে উন্মূলিত হয় নাই। মহাত্মা বিদ্যাসাগর বলিয়া গেলেন, "তুমি যাহার উপকার করিবে, সে-ই তোমার নিন্দা করিবে।" শুধু নিন্দা নয়, তুমি যাহার উপকার করিবে, সে-ই তোমার অনিষ্ট করিবে! দুগ্ধ কলা দিয়া সর্প পুষিলে সে বরং অনিষ্ট না করিতে পারে, কিন্তু এ দেশের অনেক মানুষ উপকারী বন্ধুর সর্ব্বনাশ করিবেই করিবে। প্রত্যুপকার কথাটা এদেশের অভিধান হইতে যেন বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। বুকে করিয়া কাহাকেও মানুষ করিয়া ছাড়িয়া দেও, সুবিধা পাইলেই সে তোমার সর্ব্বনাশ সাধন করিবে! কে কাহার শত্রু বল ত? প্রধান শত্রু মানুষের ষড়রিপু, আর শত্রু দেশের আত্মপ্রতিম উপকৃত জনবর্গ। জাতীয়তার মূলে হিংসা-বিদ্বেষ-কৃতঘ্নতা যেন গজ-গজ করিতেছে। কেবল ফ্রটাস নয়, কেবল মুর্জাফর, জগৎসেট বা রাজবল্লভ নয়, কত কত হিংসা বিদ্বেষ ও কৃতঘ্নতার জীবন্ত মূর্ত্তি যে চতুর্দ্দিকে প্রাণপ্রতিম উপকারী বন্ধুর অনিষ্ট সাধনে বদ্ধপরিকর, তাহার সংখ্যা হয় না। চতুর্দ্দিকে দলাদলি, চতুর্দ্দিকে দেশের কত গুপ্তচর, কত ডিটেক্‌টিভ, কত হাকিম, কত বৈতনিক ও অবৈতনিক চেলা—এদেশের কত জনের রক্ত মাংস কৃমি-কীটের ন্যায় নিয়ত ধ্বংস করিতেছে! কত জনকে অন্যায় রূপে লাঞ্ছিত এবং চিহ্নিত হইতে হইয়াছে। নিজ লোকের দ্বারা এরূপ অনিষ্ট বুঝি বা আর কোন দেশে হয় নাই। উহারা জানে যে প্রকৃত পেট্রিয়টের নিকট অত্যাচার বা লাঞ্ছনার কোনও মূল্য নাই, কিন্তু তবও স্বভাবের দোষে

অন্যের [illegible] সাধনে তাহারা চেষ্ট ! বিশ্ব মানবতা, উদার প্রেম,—স্বার্থনাশ ভিন্ন জা[illegible] না। আমরা নিজেরাই যখন নিজেদের মহা অনিষ্ট করিতেছি, তখন এদেশে কিরূপে উদার প্রেম জাগিবে, বলত ? এজন্য দেখিতেছি, আমরা অন্যকে কর্ত্তব্যে উদ্বুদ্ধ করিতে যত বদ্ধপরিকর, আবেদন নিবেদনে যত মজবুত, পরসেবা করিতে, পরের উপকার করিতে তত লালায়িত নই,—নিজেরা কাহারও উপকার করিতে চাহি না। ভেড়ার পালের ন্যায় এদেশের কত মানুষ নিত্য দুর্ভিক্ষে মরিতেছে, আমরা নীরবে তাহা দেখিতেছি। কত লোক অশিক্ষায় মজিতেছে, আমরা আরো তাহাদিগকে অশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত করিতে চাহিতেছি। একাকী গোখলে কি করিবেন ? আমাদের কত নেতা, কত মহারথী এ সম্বন্ধে উদাসীন, জান কি ? তথাকথিত নেতা প্রকাশ্য পত্রিকায় * নিম্নশ্রেণীর শিক্ষার বিরুদ্ধে লিখিতেছেন। এ দেশের কত লোক একবিন্দু ঔষধ পাইতেছে না, কত লোক জমীদারের, কত দরিদ্র ধনীর, কত অশিক্ষিত শিক্ষিতের অত্যাচারে অস্থির, কই দশজন লোককেও সেজন্য কাতর হইতে দেখিতে পাই না। পাশ্চাত্য শিক্ষায় এ দেশে মহা স্বার্থপরতা আনিয়াছে। এই অবস্থায় কিরূপে নিম্নশ্রেণী জাগিবে, বলত ? বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিতেন, "আমাদের দেশের নিম্নশ্রেণীকে আমরা ত মানুষ মনে করি না। তাহাদিগকে পশুর ন্যায় মনে করি। মানুষের দ্বারা পশুর উপকার হয় কি ?" আমরা একটু শিক্ষিত হইয়াই কতরূপে আরো তাহাদের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিয়া দেই। কয়টী লোক, দেশের জন্য ভাবে বলত ? কয়টী লোক মহাত্মা গাইট, ল্যাটু, সেয়ার বা ষ্টেড [illegible] মহাপ্রাণতা পাইয়াছে বলত ? কয়টী লোক ম্যাট্‌সিনির ন্যায় বিশ্ব-প্রেমিকতা লাভ করিয়াছে বলত ? কয়টী লোক বার্নার্ড, জর্জমুলার বা বুথের ন্যায় পরোপকারে রত বলত ? দশটীও তেমন লোক খুজিয়া পাইবে না ! পাশ্চাত্য অনুকরণে চতুর্দ্দিকে জাগিতেছে, ব্রটাস সকল, মুর্জাফর ও জগৎসেটের বংশধরগণ ! কিরূপে মহাপ্রেম এদেশে জাগিবে, বলত ?

দেশের উন্নতির মূল কি ?—জাতীয় একতা। আমরা তাহা চাই কি ? তাঁহারা ভেদনীতি বলে "ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই" করিতেছেন, আমরা তাহারই পোষকতা করিতেছি। হায় রে বুদ্ধি ! রায়-বাহাদুর, রায়-সাহেব, রাজা মহারাজা উপাধির অসার আকর্ষণেই আমাদের কাল হইল। একটু আদর, একটু সম্মান, একটু যশ, একটু আপ্যায়ন, একটু স্বার্থের জন্য আমরা না করিতে পারি, এমন জঘন্য কাজ নাই অনায়াসে আমরা ঐ প্রলোভনে অন্যের সর্ব্বনাশ করিতেছি। এইত অবস্থা। এই অবস্থায় জাতীয় একতা জাগিবে কিরূপে ? নূতন পার্টিসনে বঙ্গ নাচিতেছেন, উৎকল নাচিতেছেন, বেহার নাচিতেছেন ! কেহই বুঝিতেছেন না, কি সর্ব্বনাশ হইতে চলিয়াছে ! হায় রে অদৃষ্ট ! দেব গড়িতে বানর হইয়া গেল যে !! কোথায় জাতীয় একতা ?

মহা সম্মোহন, বা সুষুপ্তির রাজত্ব চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত ! কিন্তু তাহা বুঝে কে, ভাবে কে ? আমাদের শত্রু পর নয়, আমরা নিজেরা।

* ১৩১৮ সালের মাঘ ও ফাল্গুন মাসের সাহিত্য-দর্শন দেখ।

* W T. Stead, born 1849, Journalist, Editor "Pall Mall Gazette" 1883—1889. Founded "Review of Reviews" 1890, Founded "Daily paper" 1904. Imprisoned in 1885 for publishing "The Maiden Tribute. Drowned 14th April, 1912.

আমরা যদি প্রকৃত অবস্থা বুঝিতাম,—আমরা যদি অবস্থা বুঝিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতাম, আমরা যদি ব্রিয়েঞ্জি বা ম্যাট্‌সিনির মন্ত্রগুপ্তির মর্ম্মভেদ করিতে পারিতাম, তাঁহারা কিছুতেই আমাদের কিছু করিতে পারিতেন না। আমরা যদি দর্পের সহিত বলিতে পারিতাম, পাশ্চাত্য সভ্যতা, তোমার রাজত্ব ঐ পর্য্যন্ত, আর অগ্রসর হইও না;—অগ্রসর হইয়া আমাদের অন্তঃপুরকে আক্রমণ করিও না, তবে তাহা কিছুতেই অগ্রসর হইতে পারিত না। আমাদের আহ্বানেই তাহা অগ্রসর হইয়া আচার, ব্যবহার, রীতি,নীতি সকল গ্রাস করিয়া এখন ভেদ-নীতিতে আমাদিগকে দীক্ষা দিতে বদ্ধ-পরিকর! আমরা হাস্য-নৃত্যে বিভোর—বুঝিতেছি না, কি সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে ও যাইতেছে। খ্রীষ্টত্বের অপছায়ায় দেশ ডুবিয়া যাইতেছে। অদৃষ্টের মহাচক্র!!

মহামায়ার আদেশে বাঙ্গালী এবং বাঙ্গালা ভাষাকে বড় ভালবাসি। না খাইয়া বাঙ্গালীকে খাওয়াইতে পারিলে সুখী হই, রোগশয্যায় পড়িয়াও বাঙ্গালা-ভাষার পরিচর্য্যা করিতে পারিলে জীবন পাই। কিন্তু এক্ষেত্রে কে সাহায্য করে? কে একটু সহানুভূতি দেখায়? কেবলই নির্ম্মম ব্যবহার!! তবুও কেন দেশের জন্য প্রাণ কাঁদে? কেন এ সম্মোহন? ভাবিতাম, বাঙ্গালীই ভাবতকে জাগাইবে; ভাবিতাম, বাঙ্গালা ভাষাই সংস্কৃতের বিজয় ঘোষণা করিয়া হিন্দুত্ব বজায় রাখিবে! কিন্তু যায় যে সকলই! কলিকাতা আজ শুধু মলিন ও নিষ্প্রভ নয়, বাঙ্গালী জাতি এবং বাঙ্গালা ভাষাও যেন সেই সঙ্গে সঙ্গে আজ নিষ্প্রভ হইয়াছে। বাঙ্গালীর প্রাধান্য এবং বাঙ্গালা ভাষার খর্ব্বতা স্মরণে নয়নে জল আসিতেছে! তোমাদের হীনবল হইয়া থাকিলে নৃত্য করিতে পার, কিন্তু আমরা মহা অনিষ্ট আশঙ্কায় আজ নির্জ্জনে শুধু অশ্রু-বর্ষণ করিতেছি। বাঙ্গালীর নিষ্প্রভতায় এবং বাঙ্গালা ভাষার হীনতায় ভারতও যেন আজ নিষ্প্রভ এবং হীন হইতে চলিল।—জাতীয় একতার মূলে কুঠারাঘাত পড়িল। কে রক্ষা করিবে, জানি না। হায় রে অদৃষ্ট!

যখন সমগ্র দেশ দাসত্ব-পদ-লেহনে আত্মহারা হইয়া যাইতেছে, তখন আশা করিতেছিলাম, বাঙ্গালী-প্রতিভা দেশ-জাগরণের কারণ হইবে,—হিংসা-বিদ্বেষ-কৃতঘ্নতা-অসুরকে বধ করিয়া জাতীয় একতা এই ভারতে আনয়ন করিতে সমর্থ হইবে। ভাবিয়াছিলাম, বাঙ্গালীর মহা সাধনার ফল বাঙ্গালা ভাষা দিগ্বিজয়ী ক্ষমতায় দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিবে,—আবার হিন্দুত্ব নব তেজে জাগিবে,—খ্রীষ্টত্বের অপছায়াকে পরাস্ত করিয়া আবার এই ভারতে বিজয়-ভেরী বাজিবে! কিন্তু কালের অন্তরালে যে দুর্ভোগ ছিল,তাহা কে জানিত? অদৃষ্টের মহা ভেল্কি!!

হত-মান, হৃত-ঐশ্বর্য্য, খর্ব্ব-প্রতাপ বাঙ্গালীর প্রতিভার বিরুদ্ধে এত আস্ফালন, এত যুদ্ধ-ঘোষণা, এত আন্দোলন কি ব্যর্থ হইবে? বন্ধু বলেন, বিধাতার বিধানে, নিশ্চয়, ঐ সকল ব্যর্থ হইবে। যিনি মাতৃগর্ভে রক্ষক, বাল্যে সহায়, প্রৌঢ়ে আশ্রয় এবং বার্দ্ধক্যে অবলম্বন, তিনি কখনও বাঙ্গালীকে ভুলিবেন না। তিনি বলেন, তাঁহার বিধান অলঙ্ঘ্য, তাহাতে আত্ম-সমর্পণ করিতে ভয় কি! সম্মান নাশে বাঙ্গালীর স্বার্থ ও রিপু নাশ হইবে, স্বার্থ ও রিপু নাশে নিরঞ্জন-তীরে জাগিয়া উঠিবে এমন এক অমিতাভ, শত কুমারিল ভট্ট এবং শঙ্করও যাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের প্রতাপ খর্ব্ব করিতে পারিবে না! রিপুজয়ের অপূর্ব্ব পুণ্যশ্রীতে হিন্দুত্ব আবার উজ্জ্বল হইবে।

যদি তাই হয়, তবে নিশ্চিন্ত হইয়া কর্ম্মের সাধনায়, এস ভাই, আবার নিযুক্ত হই। বিশ্ব নাশ, স্বার্থ নাশ আবার আমাদের মূল মন্ত্র হউক। হিংসাবিদ্বেষ বিসর্জ্জন দিয়া আবার আমরা হিন্দুত্বের মহা সাধনায় প্রবৃত্ত হই। আবার মাভৈঃ মাভৈঃ রবে নিজ নিজ কর্ত্তব্যে প্রাণমন ডুবাইয়া দেই ও বিধাতার বিধান পূর্ণ করিতে আত্ম-সমর্পণ করি।

ভাই, দুঃখ দুর্দ্দিনের আর বাকী আছে কি? ধনহীন, জনহীন, মানহীন, ধর্ম্মহীন, চরিত্রহীন আমাদের দুঃখের আর কি অবশিষ্ট আছে, বল? শুধু প্রাচীন গৌরব স্মরণে মনুষ্যত্ব জাগিবে না, কখনও কোন দেশে জাগে নাই; দেখ, দিন দিন আমরা পরশ্রীকাতর হইয়া কত মলিন হইয়া যাইতেছি। এই দুর্দ্দিনে এস ভাই, আমরা সকল মান অভিমান পরিত্যাগ করিয়া আত্ম-সংযম মহাসাধনায় প্রবৃত্ত হই। যদি আত্মজয় সম্ভব হয়, সংসার-জয় সম্ভব হইবে। যদি আমাদের দ্বারা সংসার জয় সম্ভব হয়, তবে একতা আনয়নও সম্ভব হইবে। যদি তাহা হয়, তবে ভারত অপূর্ব্ব শ্রীতে আবার ভূষিত হইবে। আর যদি তাহা না হয়, কলিকাতার মলিনতার সহিত বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব চির মলিন হইবে, শুধু চতুর্বিধ দাসত্বই এ ভারতে রাজত্ব করিতে থাকিবে, তখন 'তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে'—কবির এই উক্তি সার্থক হইবে, বাঙ্গালীর নাম ধরা হইতে বিলুপ্ত হইবে। কালের অন্তরালে কি আছে, কে জানে? তাহা যে চির অ-দৃষ্ট।

তাঁহারা বলেন, পুরুষকার, ভারতবর্ষ বলেন, অদৃষ্ট। তাঁহারা বলেন চেষ্টা, ভারতবর্ষ বলেন, অদৃষ্টে নির্ভর। চেষ্টার ফল—নেপোলিয়ন ও রাবণ, নির্ভরের ফল ম্যাটসিনি, অর্জ্জুন ও শ্রীরামচন্দ্র। আমরা খ্রীষ্টের অপছায়ার মায়া ছাড়িয়া, মহা-সংযম-তপস্যায় আত্মসমর্পণ করিয়া, তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া থাকি। নির্ভরের বলে তাঁহার ইচ্ছা নিশ্চয় জয়যুক্ত হইবে।

একটী নিবেদন।

পাঠকবর্গ! অনেক দিন আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারি নাই। অবশ্য তজ্জন্য বিশেষ দুঃখিত আছি, কিন্তু কি করি, নানা কারণে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় জীবন যাপন করিতে হইতেছে। এদিকেও এবারকার মত বেলা প্রায় অবসান, কোন্ দিন এ দেহের, বর্ত্তমান ব্যক্তিত্বের লোপ হইবে। এ শরীরের যেরূপ অবস্থা এবং ইহার উপর দিয়া নানা শ্রেণীর যত ঝড় তুফান বহিয়া গিয়াছে, তাহাতে কখন ভাবি নাই যে, ষাট্ বৎসরেরও অধিক চলিবে. কিন্তু আজও চলিতেছে. মনে হইতেছে, বুঝি আরও কত দিন চলিবে। দেখা যাক্, নারায়ণ উহার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিতেছেন।

দেহ জরাজীর্ণ হইয়াছে বটে, কিন্তু ভিতরকার জিনিষ মনটা ত ঠিক পঁচিশ বৎসরের মতই রহিয়াছে। সেকালে যেমন এক ফুসিতে হিমালয়কে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া হো হো রবে আকাশে উড়িয়া গ্রহ চন্দ্র তারাগণকে বগলদাবা করিতে ইচ্ছা হইত, এখনও ঠিক তদ্রূপই বাসনা হইয়া থাকে, বরং এখন উহা অধিকতর সম্ভব বলিয়া বিশ্বাস হয়;—যৌবনে

মানবশক্তি সম্বন্ধে যেরূপ ধারণা ছিল, এখনকার জ্ঞানের সঙ্গে তুলনা করিলে তাহা অতি সঙ্কীর্ণ বলিয়া মনে হয়।

যদি বলেন, মানবশক্তির উপর এতদূর বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও মন্ত্রমুগ্ধের অবস্থা কেন? ঐ টুকুই ত মজা! ঐখানেই ত গণ্ডগোল। চারিদিকে ঐরূপ প্রবল বিশ্বাস দেখিতে পাইলে আমার এ দুর্দ্দশা ঘটিত না। তাহা কৈ? ঘরে বাহিরে দেশের সর্ব্বত্র যাহা দেখিতেছি, তাহাতে ত স্পষ্ট বোধ হইতেছে, আবালবৃদ্ধ-বনিতা সবাই যেন ঘুমের ঘোরে অচেতন, মোহের বশে অসাড়। কাজেই আমিও হাত-পা-বাঁধার মত পড়িয়া আছি। আগে বুঝিতাম না এরূপ কেন হয়, এখন উহার কারণ বেশ বুঝিয়াছি। মানুষ যদি প্রত্যেকে আলাদা আলাদা, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জীব হইত, কোন কথা ছিল না, পরন্তু তাহা ত নয়। প্রকৃত কথা এই যে, একের পাপে সবাই পাপগ্রস্ত, একের পুণ্যে সবাই পুণ্যবান, জীবমণ্ডলীর মধ্যে সংক্রমণ শক্তির এতই প্রাদুর্ভাব! পায়ের কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে একটী ফুস্‌কুড়ি থাকিলে যেমন সমস্ত দেহকে অসুস্থ বুঝিতে হয়, তেমনি, লোক-সমাজে একজনও দুর্ব্বল থাকিলে, সমষ্টিকে সেই দুর্ব্বলতা আক্রমণ করিবেই।

এখন বোধ হয় পাঠক বুঝিতে পারিলেন, আমার অকর্ম্মণ্যতার কারণ কি। আমার উল্লিখিত বিশ্বাসের শক্তি যদি বিপুল হইত, আমি হয় ত উহা দ্বারা আর দশজনকে অনুপ্রাণিত করিয়া ক্রমে তাঁহাদের দ্বারা সমাজের বলবৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইতাম; কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমার ত পুঁজি নিতান্ত কম; সুতরাং তত্তুর ক্ষমতা কোথায়? চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া বুদ্ধি প্রায় লুপ্ত; তাই প্রার্থনা, কথা-বার্ত্তায় যদি অসংলগ্নতা বা অসামঞ্জস্য দেখেন, পাঠক আপনার মত বুঝিয়া লইবেন।

কোন ইউরোপীয় সাধু-মহাত্মা একবার বলেন যে, তিনি আমাদের কল্যাণের জন্য দেশত্যাগী হইয়া ঘুরিতেছেন, যাহাতে ভারতবর্ষের হিত হয়, সে জন্য তিনি সাধনা করিতেছেন। কিছুকাল পরে তাঁহারই মুখে এরূপ শুনা গেল যে, এদেশের লোকের মঙ্গল-চেষ্টা বৃথা, কারণ ইহারা নিজেদের স্বার্থ আদৌ বুঝিতে পারে না, এক্ষেত্রে আরও বহুকাল অপেক্ষা না করিলে কোন কাজ আরম্ভ করা যাইতে পারে না। এ অপবাদ কিরূপ? আমরা স্বার্থ বুঝিনা? আমরা ত ঘোর স্বার্থপর, পরার্থপরতা শব্দটি আমাদের অভিধান হইতে মুছিয়া ফেলা হইয়াছে। সে স্বার্থ নয়, সে স্বার্থ নয়। ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ স্বার্থ ষোল আনা বজায় রাখিয়া চলিতে আমরা প্রত্যেকে খুব মজবুত বটে; পরন্তু জাতীয় স্বার্থ-বোধ আমাদের কোথায়? সমষ্টির কল্যাণ চিন্তা করি কৈ? সে দিকে যে একেবারে দৃষ্টিহীন। সাহেবপুঙ্গব তাহারই উল্লেখ করতঃ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইয়াছে, একের উন্নতিতে সবাই উন্নত, একের অবনতিতে সবাই অবনত হয়, এই কথাটা আমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকে মোটেই বুঝিতে পারে না, আর যদি কেহ ভাবার্থ বুঝেন, তিনি উহা জীবনের ব্যবহারে পরিণত করিয়া উঠিতে পারেন না। কাজেই সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতার বশবর্ত্তী হইয়া যদি প্রত্যেকে কেবলই নিজের কোলে ঝোল টানিতে থাকেন, সেই ক্ষুদ্রবুদ্ধি দ্বারা যে অল্পবিস্তর সকলকেই ক্ষুদ্র হইতে হয়, বলহীন হইতে হয়, তাহার দিকে খেয়াল না

থাকাটাই আমাদের দুর্দ্দশার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাল্যকালে যে পড়িয়াছিলাম, এক সময়ে হস্তপদাদি প্রত্যেক অঙ্গ স্ব স্ব প্রধান হইয়া কেহ কাহারও সাহায্য করিবে না স্থির করায়, দেহটা নাশের পথে দাঁড়াইয়াছিল; ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ঠিক সেইরূপ ঘটিয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহস্র ভাগে বিভক্ত হইয়া একা একা নাচিব কুঁদিব, ইহাই দেখিতেছি অনেকের অভিপ্রায়, তাহাতে যে সকলকেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে হইবে, সে জ্ঞান নাই, কিম্বা যদি কেহ বুঝিতে পারেন, তিনিও মনে মনে ঠিক দিয়া বসিয়া আছেন, apre moi deluge—আপাততঃ ত আমরা দশ দিন মজা করিয়া লই, হঠাৎ ত আর ইহার কুফল ভোগ করিতে হইবে না, তার পর আমরা চলিয়ে গেলে যাহা হয় হইবে, আমার দেহান্তের পর যদি সংসার ডুবিয়া যায়, আমার তাহাতে কি ক্ষতি, কি দুঃখ?

আমাদের সম্মুখে যদি কেহ একটা চক্‌চকে ক্ষুদ্র স্বার্থ আনিয়া ধরে, অমনি আমরা বগল বাজাইতে বাজাইতে লাফাইয়া উঠি, আপাতত মধুর বলিয়া বোধ হইলেও, উহার পরিণাম কটু কি তিক্ত, তাহা ভাবিয়া দেখি না, হয় ত ওদিকে ভাবিবার শক্তিটুকুও আর নাই। শেষে যে শির গড়িতে বানর হইবে, তাহা বুঝিয়াও বুঝি না, এত সঙ্কীর্ণ সীমাতে আবদ্ধ আমাদের দৃষ্টি।

বাহিরের শত্রুকে পারা যায়, কিন্তু ঘরের ঢেঁকি কুমীর হইলে আর উপায় কি? কোথা হইতে কি হইবে? মনুষ্যত্ব কোথায়? শুধু মানুষের মত হাত, পা, মুখ, চোখ, নাক হইলেই কি মনুষ্যপদবাচ্য হয়? মনুষ্যত্ব ফলার নয়, অনেক সাধনা অনেক তপস্যার ফলে মনুষ্যত্ব লাভ হইয়া থাকে। একবার টাইটানিক* জাহাজখানার শেষাবস্থার দিকে তাকাও, বুঝিবে, মনুষ্যত্ব কি জিনিস। যাহারা ডুবিল, তাহারা কি বীরত্বের সহিত মৃত্যু আলিঙ্গন করিল, দুদণ্ড স্থির হইয়া ভাবিবার কথা। কাপ্তেন সাহেবের কি ত্যাগস্বীকার। কি কর্ত্তব্যপরায়ণতা। শেষ নিশ্বাস পর্য্যন্ত কিরূপ নিজেকে ভুলিয়া পরকে বাঁচাইতে ব্যস্ত, ব্যগ্র, উদ্যমশীল!!! মহাপুরুষ ষ্টেড্‌† কিরূপ শান্ত ভাবে তনুত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইলেন! যে সকল মেম স্বামীকে ফেলিয়া নিজে বাঁচিতে চাহিলেন না, তাঁহারাই বা কোন্ শ্রেণীর মহাজীব। বিলাতের সকলই অদ্ভুত, কেবল সতীত্ব সম্বন্ধে এতদিন অনেকের ধোঁকা ছিল, সে ধাঁদাটাও আজ অনেকটা ঘুচিল।

অর্দ্ধপাশব শ্রেণীর মানুষ এক রকম, আর অর্দ্ধ দেবতা মানুষ অন্য প্রকার, একথা আমরা বুঝি কি? আমরা ত কেবল জানি, ভিন্ন জাতির দোষ অনুসন্ধান করিতে। আমাদের ধারণা ঠিক হউক না হউক, উচ্চকণ্ঠে ত সর্ব্বদা প্রকাশ করিয়া থাকি যে—আমরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি, আর সবাই ধর্ম্মহীন, নীতিহীন, ঈশ্বরের ত্যজ্য সন্তান। কিন্তু ওটা কি ঠিক কথা? পুরাকালে এদেশে অধিবাসীরা কিরূপ উন্নত ছিল, সে কথা আলাদা, বর্ত্তমানে আমরাই বা কোথায়, আর পাশ্চাত্য জগতের পরার্থপর ত্যাগী বীর-প্রকৃতি মহাজীবগণ কোথায়! সমষ্টির কল্যাণ কামনায় ব্যষ্টির ব্যবহার কিরূপ হওয়া উচিত, ইউরোপ আমেরিকার নিকট তদ্বিষয়ে এখনও আমাদিগকে অনেকদিন শিক্ষানবিশী করিতে হইবে।

উপসংহারে টাইটানিকের সম্বন্ধে ইহা

* White Star Line Steamship Titanic, Captain Smith. † W. T. Stead.

বলিতে হয় যে, টাইটানিক ডুবিয়াছে, কিন্তু কীর্ত্তি কখন নাশ পাইবার নয়, কল্পান্ত পর্য্যন্ত পৃথিবী উহার গুণগান করিতে থাকিবে। টাইটানিক আমাদিগকে যে-শিক্ষা দিতে আসিয়াছিল, তাহা যেন আমরা হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিতে পারি, ভগবান আমাদের সকলকে সেইরূপ বল প্রদান করুন। নিবেদক—

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

বসুমতীর ব্যবহার।

"প্রতিবধ্নাতি হি শ্রেয়ঃ পূজ্য-পূজা-
ব্যতিক্রমঃ"।
—কালিদাস।

যাঁহারা বিবিধগুণে, জ্ঞানে, মর্য্যাদায় দেশের ও সমাজের মুখ সমুজ্জ্বল করিয়াছেন, যাঁহারা প্রকৃতই সকলের সম্মানার্হ, ঈদৃশ লোকের উপরে যাঁহারা ঈর্ষাকলুষিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অপদস্থ করিতে চেষ্টিত হন, আমরা তাঁহাদিগকে দেশের ঘোরতর অপকারী বলিয়াই বিবেচনা করিয়া থাকি। প্রকাশ্য পত্রিকার সম্পাদনের ভার যাঁহাদিগের উপরে অর্পিত আছে, তাঁহাদের দায়িত্ব অতীব গুরুতর। যাঁহারা এই দায়িত্বের গুরুভার মস্তকে লইয়া কার্য্যে অগ্রসর হন, তাঁহাদিগকে প্রতি পদ-বিক্ষেপেই অত্যন্ত সাবধান হইয়া চলিতে হয়। বড় দুঃখের বিষয় যে, এদেশের লোকে এই দায়িত্ব ও সতর্কতা ভুলিয়া গিয়া, সময়ে সময়ে এরূপ ভাবে ব্যক্তিবিশেষের কার্য্যকলাপের সমালোচনা করিতে আরম্ভ করেন যে, তাহা দেখিয়া স্বতঃই মনে হয় যে, ইহাঁরা পত্রিকা পরিচালন-ব্রতে যে সংযম, ধৈর্য্য, বিনয় ও আত্ম-সম্মানের অবলম্বন একান্ত কর্ত্তব্য,—তাহাতে একেবারে জলাঞ্জলি দিয়াছেন। এজন্য আমাদের মনে হয় যে এদেশে যথাযথ ভাবে পত্রিকা পরিচালনের সময় এখনও বহু দূর।

আজ কয়েক সপ্তাহ হইতে "বসুমতী" পত্রিকা যে প্রকার অশিষ্ট ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছেন, যে কুৎসিৎ বিদ্রূপাত্মক ছবি ও বাক্য-প্রয়োগ অবলম্বন করিয়া দেশের সম্মানার্হ ও পদস্থ ব্যক্তিবর্গের কুৎসা গাহিতেছেন;—তাহা দেখিয়াই আমরা উপরি-উক্ত মন্তব্য প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম।

কয়েক দিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রবাবুকে লইয়া "বসুমতী" কতই বিদ্রূপ করিলেন। তারপরে ডাক্তার শ্রীযুক্ত আশুতোষ বাবু ইহাঁর লক্ষ্য হইয়াছেন। কেবল ইহাই নহে। আমাদের বিবেচনায়, "এতদ্দেশের সম্মানাস্পদ, সর্ব্বজন-পূজনীয়, সমগ্র ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকেই আক্রমণ করিয়া, তাঁহাদিগকে উপহাসাস্পদ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কতকগুলি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মুণ্ড আঁকা হইয়াছে; ঐ সকল মুণ্ডে সুদীর্ঘ শিখার সংযোজন করিয়া, উহার "আর্কফলা" নামকরণ করা হইয়াছে; ঐ সকল সুদীর্ঘ "আর্কফলা" একত্রীভূত করিয়া, আশুবাবুর হস্তের মুষ্টি মধ্যে অর্পণ করিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। বসুমতী এই কুৎসিৎ বিদ্রূপ দ্বারা পাঠকবর্গকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন যে,—যেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতবর্গ আপন আপন গভীর বিদ্যাবুদ্ধি, সর্ব্বজন-মহনীয় বিপুল সম্মান এবং আপনাদিগের চির-সেবিত পদ-মর্য্যাদা একেবারে বিসর্জ্জন

দিয়া আশু বাবুর হস্তের ক্রীড়নক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন!!! অপর দিকে, বসুমতী ইহাও বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন যে,—আশু বাবুও যেন চির-পরিচিত বিদ্বদ্বর্গের প্রতি ঐকান্তিক সম্মান ও গুণ-পক্ষপাতিতা ত্যাগ করিয়া, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতবর্গকে লইয়া একটা খেলার সামগ্রীরূপে পরিণত করিতেছেন!!! বসুমতীর এই প্রকার প্রগল্‌ভতা, দেশপূজ্য মহা সম্মানার্হ ব্যক্তিবর্গের প্রতি এই প্রকার মর্ম্মঘাতী উপহাস ও বিদ্রূপ, ভদ্র সমাজের অত্যন্ত বিগর্হিত ব্যাপার বিনা, ঠিক পাঠকবর্গ তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

পূজ্যপাদ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-মণ্ডলী এবং ভারতের যথোজ্জ্বলকারী আশুবাবু,—ইহাঁদিগের কোন্ অপরাধে আজ "বসুমতী" ইহাঁদিগকে এই প্রকার সর্ব্বজন-বিগর্হিত লাঞ্ছনা করিতে উদ্যত হইয়াছে,—এখন পাঠকবর্গকে আমরা সেই কাহিনীটী শুনাইব।

আশু বাবুর সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা, তাঁহার সর্ব্বশাস্ত্রদর্শিতা, তাঁহার বিপুল জ্ঞান ও গভীর পাণ্ডিত্য, সর্ব্বোপরি, তাঁহার অসামান্য কর্ম্ম করিবার আশ্চর্য্য শক্তি,—এ সকল কথা পাঠকবর্গকে নূতন করিয়া কিছুই বলিয়া দিতে হইবে না। ইহাঁর হস্তে এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ কতদূর উন্নতি সাধিত হইতেছে, তাহা সকলেরই বিদিত আছে। সে সকল কথা বলিবার এস্থলে কোন আবশ্যক নাই। কয়েক বৎসর হইতে ইনি এদেশের সংস্কৃত শিক্ষা-সমিতির সভাপতিরূপে, টোলের ছাত্রবর্গের সংস্কৃত পাঠ্য-নির্ব্বাচন, পরীক্ষা ও বৃত্তিদান পদ্ধতির পরিচালনা ও সংস্কৃত আদ্য, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষার তত্ত্বাবধান প্রভৃতি কার্য্যে যে নিপুণতা প্রদর্শন করিতেছেন, তাহাও পাঠকবর্গের অবিদিত নহে। ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট ইহাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ও কার্য্যকুশলতা দর্শনে চমৎকৃত হইয়া, তাহার পুরস্কার-স্বরূপ, বিগত দিল্লীদরবারে ইহাঁকে "নাইট" উপাধিদ্বারা গৌরবান্বিত করেন। আমরা কথায় কথায় "বিদেশী রাজা" আমাদিগকে বুঝিল না, আমাদিগের যথাযথ সম্মান ও আদর করিল না,—ইত্যাদি কথা সর্ব্বদাই বলিয়া থাকি। কিন্তু যখন সেই "বিদেশী রাজাই", আমাদের স্বদেশবাসী একজন সর্ব্বগুণোজ্জ্বল ব্যক্তির প্রকৃত গুণ-দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া, তাহা বুঝিতে পারিয়া, সেই গুণালীর সম্মাননা করিলেন, তখন দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-মণ্ডলী কি প্রকারে নীরবে বসিয়া থাকেন? তাই তাঁহারা একত্র মিলিত হইয়া, সভা করিয়া, সে দিন আশু বাবুকে সম্মাননা করিতে উদ্‌যোগী হইয়াছিলেন। "বসুমতী" এই দৃশ্য সহ্য করিতে পারিলেন না। অমনি তিনি আশু বাবু ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতমণ্ডলীকে বিদ্রূপ করিতে বসিয়া গেলেন। হা দুর্দৈব!!!

যিনি অক্লান্ত যত্নে, বহুবিধ বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে বিবিধ চেষ্টা করিয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং টোলে সংস্কৃত ভাষার পঠন-পাঠন যাহাতে অব্যাহত থাকে ও দিন দিন সংস্কৃতের চর্চ্চা বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তজ্জন্য বিপুল যত্ন করিতেছেন, নিজের প্রভাব ও শক্তি ব্যয়িত করিতেছেন,—তাঁহাকে যদি কেবল মাত্র "বিদেশী রাজাই" সম্মান করেন; কিন্তু স্বদেশবাসী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ নীরবতা অবলম্বন করেন;—তবে তাহা কিরূপ দেখাইত? এই জন্যই, পূজনীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সে দিন প্রকাশ্য সভায় আশু বাবুর সম্মাননা করিয়াছেন। আশু বাবু কি প্রকার নীতি, ধৈর্য্য,

সাহস ও শ্রদ্ধার সহিত, বিবিধ প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে, এই সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চাটীকে জীবিত রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন, বাহিরের কয়জন লোক তাহার সংবাদ রাখে? আশু বাবুর ন্যায় কার্য্যকুশল, অসীম প্রভাবশালী ব্যক্তি কর্ণধার না থাকিলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ও টোলগুলির পুনর্গঠনকালে, সংস্কৃত ভাষা কোথায় ভাসিয়া যাইত, তাহা কে বলিতে পারে? কেবল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতবর্গ বলিয়া নহে; —যদি ভারতবাসী লোক এই বিপুল যত্ন ও কার্য্যনীতির জন্য আশু বাবুকে সম্মান না করে, তাঁহার উপর কৃতজ্ঞ না হয়, তাহা হইলে, আর কোথায় তাঁহার সম্মান ও কৃতজ্ঞতা দেখাইবে?

ব্রাহ্মণপণ্ডিতবর্গ অধুনা বৎসরে বহুবার আশুবাবুর সহিত মিলিত হইয়া, সংস্কৃত-শিক্ষা সম্বন্ধে বিবিধ পরামর্শ ও আলোচনা করিবার অবসর পাইয়া থাকেন। দেশের খ্যাতনামা বিদ্বান্ মাত্রেই আশুবাবুর নিকটে বিবিধ প্রকারে সম্মান ও উপকার লাভ করিতেছেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ এই সকল কথা জানেন বলিয়াই, তাঁহারা সেদিন সভা করিয়া আশুবাবুকে সম্মানিত করিয়াছিলেন, তাঁহার পরিশ্রম ও যত্নের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এরূপ না করিলেই বরং তাঁহাদিগকে "পাপভাক্" হইতে হইত। ইংরেজেরাও তাহা হইলে মনে মনে হাসিতেন এবং ভাবিতেন যে, এ দেশের লোক স্বদেশী লোককে হিংসা করে;—গুণীর গুণগ্রাহিতা এদেশে নাই!!!

পাঠকবর্গ দেখিতেছেন, ইহাতে আশু বাবুর কোন দোষ নাই; ব্রাহ্মণ পণ্ডিতমণ্ডলীরও কোন দোষ হয় নাই। তবে কেন "বসুমতী" ইঁহাদিগের উপরে ক্রুদ্ধ হইলেন? তবে কেন "বসুমতী" বিদ্রূপাত্মক "আর্কফলা"-সমন্বিত দীর্ঘ মুণ্ড আঁকিয়া, ব্রাহ্মণপণ্ডিতবর্গের মুণ্ডপাত করিতে বসিলেন? দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতবর্গ কি এতই কাণ্ডজ্ঞান-বিহীন হইয়াছেন যে, তাঁহারা আত্মকৃত কার্য্যের উদ্দেশ্য বুঝেন না? আশুবাবুই বা কোথায় কোন্ দিন, কোন্ ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে ক্রীড়নক করিয়া ঘুরাইয়া বেড়াইয়াছেন? এ সকল বড় গুরুতর কথা! এগুলির প্রমাণের ভার "বসুমতীর" উপরে। বসুমতীকে আমরা প্রকাশ্য আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, তিনি কোথায় ও কোন্ দিন এগুলির কি প্রকারে প্রমাণ পাইয়াছেন? তিনি যত দিন প্রমাণ না দিতে পারিতেছেন, ততদিন লোকে মনে করিবেই যে, উচ্চপদ ও মহিমাময় উচ্চ সম্মান দর্শনে ব্যথিত ও ঈর্ষাযুক্ত হইয়াই, "বসুমতী" আশুবাবুর ছবি আঁকিয়াছেন ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মুণ্ডপাত করিতেছেন॥ মুদ্রাযন্ত্র হস্তে থাকিলেই যে সংযম বিসর্জ্জন দিতে হইবে, এবং যাহা তাহা লিখিয়া কাগজের কলেবরটী পূর্ণ করিতে হইবে, এরূপ অধিকার কাহারই নাই। যাঁহারা দেশপূজ্য, তাঁহাদিগের সম্মান হানি করিতে নাই। আশুবাবুর মত সুপণ্ডিত অথচ সুবিনয়ী ও মহোচ্চহৃদয়ের লোক, বড় কমই এদেশে মিলে। বৎসরের পর বৎসরে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কত নিরীহ, দরিদ্র ছাত্র, পাশ হইয়া যাইতেছে,—ইহা কি "বসুমতী" দেখিতেছেন না? নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইবার পরে, দেশব্যাপক যে একটা ভীষণ ত্রাস ও আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল, প্রতি বৎসরের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নগুলির কাঠিন্যহীনতা সেই ত্রাসের হস্ত হইতে দেশকে উদ্ধার করিতেছে।

বসুমতী নিশ্চয় জানিবেন, ইহা আশুবাবুর প্রভাবে। এমন ছাত্রবৎসল ভাইস্‌চ্যান্‌সেলর বসুমতী আর কি পাইবেন? প্রতিবৎসর দেশের বিদ্বদ্বর্গ ইঁহার হস্তে যে সম্মান পাইতেছেন, ইহার পরে কি তাহার আশা আছে? কিন্তু হায়। "বসুমতী'র চক্ষুতে বিষ ছড়াইয়া গিয়াছে' ইনি দেখিয়াও তাহা দেখিতেছেন না। আশুবাবুর পুনর্নিয়োগও বসুমতীর সহ্য হয় নাই।

"বসুমতী", আশুবাবুকে "গোঁপো সরস্বতী" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহাতেও বসুমতীর ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-বিদ্বেষ প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে। নবদ্বীপের বিবুধ-মণ্ডলী সংস্কৃতশাস্ত্রে আশুবাবুর প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি দর্শনে "সরস্বতী" উপাধি দ্বারা তাঁহাকে আদৃত করিয়াছিলেন। এ উপাধির মূল্য অনেক অধিক। স্মরণাতীত কাল হইতেই নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী, দিগদেশীয় পাঠার্থীগণকে উপাধি দিয়া আসিতেছেন। দেশের লোকে নবদ্বীপপ্রদত্ত এই উপাধি মাথা পাতিয়া স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। নবদ্বীপের এই অধিকার সর্ব্বজনমান্য। এই উপাধির উপরে বিদ্রূপ বর্ষণের অধিকার কাহারই নাই। নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী, বিদ্বৎ-গোষ্ঠী-পরিচালিত সভার সভাপতি পদেও আশু বাবুকে বরণ করিয়াছিলেন। কেবল সংস্কৃত ভাষার পাণ্ডিত্যের জন্যই এই উচ্চ সম্মান দেওয়া হয় নাই। এখনকার কালে লোকে একটু উচ্চ পদস্থ হইলেই, অনেকে দেশীয় রীতি নীতি আচার ব্যবহার ত্যাগ করেন। কিন্তু আশুবাবু এতাদৃশ মহোচ্চ পদধারী হইয়াও, হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত ক্রিয়াকলাপের একান্ত অনুগামী এবং স্বজাতির মোচার-ব্যবহারের শ্রদ্ধান্বিত পক্ষপাতী। এত-দর্শনেও বিমোহিত হইয়া, নবদ্বীপের বিবুধমণ্ডলী ইঁহাকে আপনাদিগের সভার সভাপতি করিয়াছিলেন। ইহা কি কম সম্মানের কথা? কিন্তু বসুমতী, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-প্রদত্ত এই সম্মানের গৌরব হ্রাস করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া, সম্পাদকের আসনের মর্য্যাদা নষ্ট করিয়াছেন। অতি সংযত-ভাবে, লোক-শিক্ষার জন্য, লোকের কার্য্যকলাপ ও চরিত্রের আলোচনা করিতে হয়। ইহাই সম্পাদকগণের পবিত্র ব্রত। এই আলোচনায় ব্যক্তিগত বিদ্রূপ ও গালাগালি বর্ষণ করিলে, সেই ব্রতের পাবিত্রতা নষ্ট হইয়া যায়। আজকাল সাহিত্যক্ষেত্র হইতে, এ দেশে, এই সংযম উঠিয়া যাইতেছে। গ্রন্থ সমালোচনাতেও আমরা আজ-কাল, ব্যক্তিগত আক্রমণই দেখিতে পাই। যুক্তি তর্ক প্রয়োগে গ্রন্থের বা ব্যক্তিবিশেষের দোষগুণ কীর্ত্তন করিতে পারিলে, প্রকৃত সংযত সমালোচনা করা হয়। কিন্তু যদি ঈর্ষ্যা-প্রযুক্ত তাহাতে ব্যক্তিগত কুৎসা ও বিদ্রূপ প্রবেশ করে, তবে সে সমালোচনায় সমাজের কোন হিত হয় না। যে সম্পাদক বা সমা-লোচক এই সীমা উল্লঙ্ঘন করেন, তিনি সমা-জের হিতকারী নহেন; তিনি সমাজের শত্রু।

আমরা আজ আর কিছু বলিব না। এসম্বন্ধে বারান্তরে আরো কয়েকটী কথা উত্থাপন করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন সম্বন্ধে দুই একটী কথা।

জীব-বিজ্ঞানবিৎ শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয় পুণ্য-মুহূর্ত্তে পুণ্যতীর্থ কামাখ্যাধামে উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের পঞ্চম অধিবেশন উপলক্ষে সভাপতির আসন হইতে যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন, তাহাতে বুঝিবার বিষয়, শিখিবার বিষয় ও চিন্তা করিবার বিষয় অনেক আছে। বাস্তবপক্ষে এই সকল সভা ও সম্মিলনীতে 'মিলন ও মেশন' উপলক্ষে অজস্র অর্থব্যয় হইয়া যে সকল নব নব তত্ত্বের উদ্ঘাটন ও নব নব চিন্তার অবতারণা হয়, তাহার আবৃত্তি ও আলোচনা, অনুষ্ঠান ও আন্দোলন ব্যতীত পূর্ণতা লাভ হওয়া সম্ভবপর নহে। এইজন্যই শ্রদ্ধাস্পদ সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ আমরা বুঝিতে ও আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

সভাপতি মহাশয় অভিভাষণের প্রথমেই বলিয়াছেন, সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্দেশ্য বঙ্গ-ভাষার শ্রীবৃদ্ধি-সাধন। তাহা ঠিক। এবং সাহিত্যের উন্নতির সহিত সমাজের উন্নতি একই সূত্রে গ্রথিত, তাহাও ঠিক; কিন্তু তাই বলিয়া সমাজের উন্নতিই সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্দেশ্য, একথাটা ঠিক বুঝা যায় না। 'সমাজ' শব্দ যেরূপ বিস্তৃত অর্থে শশধর বাবু ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে সমাজের উন্নতি সাহিত্য-সম্মিলনের কেন, যে কোন সম্মিলনী এদেশে আছে বা ভবিষ্যতে হইবে, সকলেরই উদ্দেশ্য বটে। উহা কংগ্রেসেরও উদ্দেশ্য, উহা বিজ্ঞান-সভারও উদ্দেশ্য, কিন্তু তাই বলিয়া সাহিত্য-সম্মিলন বলিতে কংগ্রেসও বুঝি না, বিজ্ঞান-সভাও বুঝি না।

একদল সাহিত্যিক বলিয়া থাকেন, সাহিত্য বলিতে সুকুমার সাহিত্য বা literature proper বুঝা যায়। সুকুমার সাহিত্যের সৌন্দর্য্য ও উন্নতি সাধন, প্রাচীন গ্রন্থাবলী সঙ্কলন প্রভৃতিই তাঁহারা সাহিত্য সভার কর্ত্তব্য মনে করিয়া থাকেন।

আর একদল সাহিত্যিক বলিয়া থাকেন, শুধু কবছঁ কবছঁ লইয়া থাকিলে চলিবে না; সাহিত্যের ক্ষেত্র প্রসার করিতে হইবে, সুকুমার সাহিত্য ব্যতীতও সাহিত্য বলিতে বিজ্ঞানও বুঝিতে হইবে, এমন কি, জীবতত্ত্ব, জড়তত্ত্ব, মনোতত্ত্ব, জ্যোতিষশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্র, সমস্তই এই আখ্যার মধ্যে বুঝিতে হইবে। ইহাঁরা বলেন, যাহা কিছু মানবের হিতকর, যাহা দ্বারা মানবের উন্নতি-সাধন হইতে পারে, তাহাই সাহিত্যের পর্য্যায় অভিভুক্ত। ইহাঁরা কাব্যকেও জড় ও জীব-বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত মনে করিয়া থাকেন। পণ্ডিতবর শশধর বাবু অবশ্য শেষ দলভুক্ত। এই দুই দলের মত-সমন্বয় যে কিছু হইয়াছে, তাহা আমরা জানি না। যে বৎসরে যে দলের লোক আধিপত্য পান, সে বৎসর সেই দলের লোকের মতানুসারে সাহিত্যের আখ্যা দান ও আলোচনা হইয়া থাকে। সাহিত্য-বিশারদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার, শিক্ষিতাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত প্যারীচরণ মিত্র প্রভৃতি মনীষীবর্গ প্রথম দল-

ভুক্ত। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও স্বনামপ্রসিদ্ধ সুকবি ও সুলেখক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়গণ কোন্ দলভুক্ত, তাহা ঠিক বুঝিয়া উঠা যায় না। বুঝিবা দুই দলই তাঁহাদিগকে নিজ নিজ দলভুক্ত বলিয়া দাঁওয়া রাখেন। সাহিত্য-সভা এক্ষণে শৈশব অবস্থা হইতে কৈশোর অবস্থায় পদার্পণ করিতেছে, এক্ষণে তাড়নার সময় আসিয়াছে। এক্ষণে "সাহিত্য-সভার" নামের অর্থ ও "সাহিত্য-সভার" উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মত-সমন্বয় হইয়া একটা কিছু স্থির হওয়া আবশ্যক। পণ্ডিতবর শশধর বাবু-প্রমুখ দল সাহিত্য সভার যে অর্থ ও উদ্দেশ্য নির্দ্দেশ করেন, তাহা শব্দ হইতে আসে কিনা, জানিনা। উক্তরূপ অর্থ ও উদ্দেশ্য নির্দ্দেশ করিয়া সাহিত্য-সভার গতি পরিচালন করিতে পারিলে দেশের প্রকৃত মঙ্গলের পথ বিস্তার করা হয়, সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা শব্দের প্রচলিত ভাব হইতে আসে কিনা, সেইটাই বিবেচ্য। তবে "গাছের বুদ্ধি" নাম দিয়া সে প্রবন্ধে যেরূপ 'মানুষের বুদ্ধি' সম্বন্ধে অনেক কথাই নানাভাবে বলা চলে, তদ্রূপ, সাহিত্য-সভা নাম দিয়া অঙ্ক শাস্ত্রের "ক্যালকুলেশন থিওরী"র আলোচনাও যে না চলিতে পারে, এমন নয়। এই জন্যই বুঝিবা সেক্‌স্‌পিয়র বলিয়াছেন 'নামে কি যায় আসে'। দেশের এক্ষণে যেরূপ অবস্থা, তাহাতে দেশের বহুল অর্থ ব্যয় করিয়া দেশের গণ্য মান্য চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ যে সকল সভা সম্মিলনীতে উপস্থিত হয়, সে সকল সভা সম্মিলনীর ক্ষেত্র কেবল সুকুমার সাহিত্য আলোচনার গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ ও সঙ্কীর্ণ থাকে, ইহা আমাদের ইচ্ছা নয়; বরং বিস্তৃত হইয়া তাহাতে বিজ্ঞানের আলোচনার দ্বার মুক্ত হইয়া, স্বাধীন চিন্তার বলে নিত্য নিত্য নব নব তত্ত্বফল আবিষ্কৃত হইয়া দেশের স্বাস্থ্য ও সামর্থ্য বৃদ্ধি হইয়া দেশের উন্নতি হয়, ইহাই আমাদের ঐকান্তিক ইচ্ছা। কিন্তু "সুখাদ্য ফলের নির্যাসের কারখানা" নাম দিয়া তাহাতে জোয়ান ও জলমেঘার আরক প্রস্তুত করাটাও কেমন যেন বিষদৃশ দেখায়। সাহিত্য শব্দটা সুবিস্তৃত অর্থে বুঝিতে বুঝিতে ইহার সুবিস্তৃত অর্থটাই বোধ-গম্য হইবে, এ একটা যুক্তি সময়ে সময়ে প্রদত্ত হইয়া থাকে। তাহা হইলেও "সাহিত্য" শব্দে এক্ষণে যাহা বুঝি, তাহা বুঝিবার জন্য একটী নূতন শব্দের আবশ্যক। যদি নূতন শব্দই আলোচ্য হয়, তবে সাহিত্যের পুরাতন অর্থটা লোপের হেতু কি? সাহিত্য-সভাকে সাহিত্য ও বিজ্ঞান সভা নাম না দিলে, ক্রমে সকল বিষয়ের আলোচনা একটু অসুবিধা-জনক হইয়া উঠিতেছে। কেবল মাত্র সুকুমার সাহিত্যের আলোচনা ও সংগ্রহেও দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে। সুকুমার সাহিত্য হউক, সঙ্গীত-শাস্ত্র হউক বা যে কোন কলাবিদ্যা হউক, যে কোন স্বাধীন, সভ্য ও সমুন্নত দেশে ইহার যে কোনটার পূর্ণ আলোচনায় বহু অর্থ ব্যয় হয় ও বহু মনীষা-সম্পন্ন লোক ঐরূপ আলোচনায় নিযুক্ত থাকেন। সকল বিষয়েই দেশের অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা। যদ্যপি এদেশে অর্থের ও মনীষা-সম্পন্ন ব্যক্তির এরূপ প্রাচুর্য্য থাকিত যে, কেবলমাত্র সুকুমার সাহিত্যের আলোচনার জন্য প্রচুর অর্থ ও প্রচুর ধীশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি মিলিতে পারিত, অন্যদিকে বিজ্ঞান আলোচনা সম্বন্ধেও তদ্রূপ বহু অর্থ ও বহু জ্ঞানী লোকের সমাগমের অভাব না হইত, তাহা হইলে সুকুমার সাহিত্য-সভা, বিজ্ঞান-সভা, জ্যোতিষ-সভা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন

সভা ও পৃথক্ পৃথক্ অনুশীলন দেশের পক্ষে আরও উপকারী হইত। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, দেশে এক্ষণে ধীশক্তিসম্পন্ন জনের বা ধনের, কোন বিষয়েরই তেমন প্রাচুর্য্য নাই। এইজন্যই সাহিত্যসভায় কেবলমাত্র সুকুমার সাহিত্যের আলোচনার আমরা পক্ষপাতী নই, বিশেষত দেশের অবস্থানুসারে কোন কোন বিষয়ের আলোচনা অগ্রগণ্য করা আবশ্যক হইয়াছে। যাঁহারা সাহিত্যের মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্য লইয়া বিচার করিতেছেন, তাঁহারাও দেশের উপকার করিতেছেন, যাঁহারা পুরাকালে হিন্দুর শিল্প ও স্থপতি-বিদ্যা কতদূর উন্নত হইয়াছিল, হিন্দুর দেব-গঠন-প্রণালী ও মন্দির-গঠন-প্রণালীর কি আদর্শ ছিল, তৎ বিষয়ে আলোচনা করিতেছেন, তাঁহারাও দেশের উপকার করিতেছেন। যাঁহারা চিত্র বিদ্যায় হিন্দু আদর্শ পুনর্জীবিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারাও দেশের উপকার করিতেছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু দেশের যে অবস্থা, তাহাতে দেশ রক্ষার জন্য যে আলোচনা আবশ্যক, তাহাই সর্ব্বাগ্রে আলোচ্য। দেশের অবস্থা বিবেচনায় বিজ্ঞানের আলোচনাই দেশের পক্ষে, এক্ষণে প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই জন্যই চিন্তাশীল মহারাজা মনীন্দ্র নাথের সহিত শশধর বাবুও বলিয়াছেন, "বিজ্ঞানই আমাদিগের মূল ভিত্তি"। সকল শাস্ত্রের আলোচনাই সাহিত্যের ভিতর দিয়া করিতে হয়, বিজ্ঞানের আলোচনাতে সাহিত্যের উন্নতি হয়। শ্রীযুক্ত শশধর বাবু যে অভিভাষণ লিখিয়াছেন, ইহারও মূল উদ্দেশ্য, বিজ্ঞানের আলোচনা—জীবতত্ত্বের আলোচনা। জীবতত্ত্ব ও জাতিতত্ত্বের মূল সূত্রগুলি যাহাতে আমাদের দেশে সম্যক আলোচিত ও বিচারীকৃত হইয়া দেশের স্বাস্থ্য ও স্বাধীনতা আনয়নের উপায় স্বরূপে নিযুক্ত হয়, ইহাই, বোধ হয়, তাঁহার অভিভাষণের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহা হইলেও অভিভাষণের ভাষা যেরূপ পরিপাট্য, বর্ণনার যেরূপ মাধুর্য্য, তাহাতে গৌণ ভাবে ইহাকে সাহিত্যের উন্নতি কল্পে লিখিতও বলা যাইতে পারে। তবাচ শশধর বাবুর অভিভাষণ সাহিত্যিক হিসাব অপেক্ষা বৈজ্ঞানিক হিসাবেই অধিক মূল্যবান।

সংসার-স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই কোন না কোন সময়ে মনে হয়, আমাদের উন্নতি কি হইবে? হইলে তাহার উপায় কি? আমাদের উন্নতি হইবে কি না, সে প্রশ্নের মীমাংসা অনাবশ্যক ও তাহার মীমাংসা করাও যায় না। উন্নতি করিতেই হইবে, এবং তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতেই হইবে, এই আশার বাণী লইয়াই আমাদিগকে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। এই উন্নতির পন্থা ভিন্ন ভিন্ন লেখক ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। শশধর বাবু জীব-বিজ্ঞান-বিৎ। তিনি মনে করেন, জীব-বিজ্ঞানের অনুশীলনে যে সকল নব নব নিয়ম উদ্ভাবিত ও প্রচারিত হইতেছে, তাহা মানিয়া চলিবার চেষ্টা না করাই আমাদের জাতীয় অধঃপতনের মূল। এবং ক্রমে জীব-বিজ্ঞানের আলোচনা করিয়া ও যে যে নিয়মে তথ্য সংগ্রহ করিতে হয়, সেই সেই নিয়মে তথ্য সংগ্রহ করিয়া জীব-বিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে চলিলেই জাতীয় উন্নতি হইবে। জীব-তত্ত্বের সূত্রগুলি সমাজে প্রচলন করাইবার জন্য ইংলণ্ডে ও অন্যান্য পাশ্চাত্য প্রদেশে বিশেষ আন্দোলন হইতেছে সত্য; কিন্তু এখনও বোধ হয়, তাহা জনসাধারণ মধ্যে বা সমাজের কোন শ্রেণী মধ্যে গৃহীত হয় নাই।

সমাজ মধ্যে ঐ সকল মত চালাইলে উহা সমাজের পক্ষে নিশ্চয়ই হিতকর হইবে, এরূপ জ্ঞানও ইংলণ্ডে বা অন্য কোন পাশ্চাত্য প্রদেশে জনসাধারণ মধ্যে বিস্তৃত হইয়াছে বলিয়া অবগত নই। সেই সকল সূত্রগুলি এদেশে খাটাইবার চেষ্টা করা এক্ষণে সর্ব্বতোভাবে সমীচিন কিনা, তাহাও ঠিক বুঝিতে পারি না। ইংলণ্ডের বিবাহ বিষয় আলোচনা করিয়া কোন কোন জীব-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত এরূপ মতও নাকি প্রকাশ করিয়াছেন যে, উচ্চশ্রেণী মধ্যে বাল্য বিবাহ প্রচলন বরং উপকারী। এরূপ মত এ দেশে, গ্রহণের পূর্ব্বে, বিশেষ বিবেচ্য। এই জন্য প্রথমতঃ জীবতত্ত্বের আলোচনা পূর্ণভাবে হওয়া উচিত। চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে ঐ বিজ্ঞান আলোচনা করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য এবং উহার আলোচনায় যে ফল পাওয়া যায়, তাহা ক্রমে লিপিবদ্ধ করিয়া তাহার অনুশীলন করতঃ যদ্যপি বুঝিতে পারি যে, উহা হইতে যে সকল সত্য আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহা সমাজের মঙ্গলজনক, তবে তাহা দেশীয় জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা কর্ত্তব্য হইবে। ঐ বিজ্ঞানের সম্যক্ আলোচনা ইংলণ্ডে আরম্ভ হইয়াছে; ইংলণ্ডে ঐ সকল বিষয়ের আলোচনার জন্য যে সকল সভা সমিতি আছে, তাহাদের সাহায্য ও উপদেশ লইয়া তন্মূলে নিজে নিজে পরীক্ষা করা আবশ্যক হইয়াছে। জীবতত্ত্ব এমন একটী বিষয়, যাহার আলোচনায় সম্ভবতঃ ভবিষ্যতে জাতীয় জীবনের উন্নতির এক নূতন পথ উদ্ঘাটিত হইবে। হয় তো জীব তত্ত্বের তরুণালোকে এই দুঃখদগ্ধ জগৎ পবিত্র ও শান্তিসুধাপূর্ণ অমরাবতীতে পরিণত হইবে; রোগ তাপ, শৈশব মৃত্যু, অকাল মৃত্যু ধরণী হইতে দূরে পলায়ন করিবে, শান্তি, স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্যে ধরা পরিপূর্ণ হইবে। যোগ্যের সহিত যোগ্যের মিলনে শত শত বুদ্ধদেব, শ্রীচৈতন্য, কবির ও নানক, জগাই ও মাধাই, রামমোহন ও কেশব সেন, বিদ্যাসাগর ও দেবেন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ, লুথার ও পার্কার, কালিদাস ও ভবভূতি, হেযার, সেকসপিয়ার, নিউটন ও গেলিলিও, গ্যারিবল্ডী ও ম্যাটসিনী, রাণা প্রতাপ ও সংগ্রাম সিং জন্ম গ্রহণ করিয়া অবনীতে শান্তি সুধা বিতরণ করিবে। অযোগ্যের সহিত অযোগ্যের মিলন অসম্ভব হইয়া নিরো বা দ্বিতীয় আলেকজেণ্ডার প্রভৃতি জগতে আর পুনরাগমন করিবে না, হয়তো বিবাহ বন্ধনের সুনিয়মে দুর্ব্বলহৃদয় লক্ষ্মণ সেন বা উদয় সিং আর ধরাধাম কলঙ্কিত করিবে না। হয়তো জীব-বিজ্ঞানের সাহায্যে কবির টেলিসনের নিম্নলিখিত ভবিষ্যৎ আশা পূর্ণ হইবে—

হোরা বাজে ঘন ধনাঢ্য নির্ধন,
কলহ করহ দূর,
ধরণীর শেল দৌরাত্ম আচার,
ভাঙ্গিয়ে করহ চূর।
ধরণীর বিষ পরহিংসাদ্বেষ
পরদুঃখে কর খেদ,
ঐ বাজে হোরা পুরাতনে সরা,
ঘুচায়ে অবনী ক্লেদ,
সহস্র বৎসর উৎকট বিগ্রহ
উত্তাপে ধরণী জরা
সহস্র বৎসর শান্তির সলিলে
শীতল হউক ধরা। ৩

কিন্তু জীবতত্ত্ব এখনও সম্পূর্ণ আলোচিত হয় নাই। উহা সভ্য ও স্বাধীন জগতের মানব সমাজে সুগৃহীত না হওয়া পর্য্যন্ত, এই পরাধীন বঙ্গীয় বা অসমীয় সমাজে উহা অবশ্য চালাইতে কেহই পরামর্শ দিবেন না। শ্রদ্ধা-

স্পদ শশধর বাবুও সেই জন্য অতি সন্তর্পণে বলিয়াছেন "এইরূপে মানব তত্ত্বের এবং সমাজ তত্ত্বের বহুবিধ নিয়ম আবিষ্কার করা যাইতে পারে অথবা পূর্ব্বাবিষ্কৃত বিধান সকল এতদ্দেশে পরীক্ষিত হইতে পারে।" শশধর বাবু জীব-বিজ্ঞান পড়িয়া বিশ্বাস করেন, উহা দ্বারা সমাজের উপকার হইবে এবং সেই জন্য সাহিত্য-সভাতে উহার সম্যক আলোচনা করিবার জন্য উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। তিনি সাহিত্য-সভাকে একটা নূতন পথ অবলম্বন করিতে বলেন—সে পথটী এই যে, দুদিন একটা বিষয় আলোচনা করিয়া ক্ষান্ত হইলেই হইবে না। ব্রিটীস এসোসিয়েসনের আদর্শ মতে এই বিষয়টীর বর্ষব্যাপী আলোচনা করিতে হইবে এবং বর্ষব্যাপী তথ্যানুসন্ধানের ফল বাৎসরিক সভায় আলোচনা করিয়া সত্য নির্ণয় করিতে হইবে। ইহা অতি কঠিন উপদেশ এবং আমরা একরূপ ধরিয়া লইতে পারি, 'জলের বিম্ব যেমন জলে উদয় হইয়া জলেই মিশাইয়া যায়', এ উপদেশ-বাণীর ভাগ্যেও তদ্রূপই হইবে। বাস্তবপক্ষে কথা অপেক্ষা এক্ষণে কার্য্যেরই আবশ্যক হইয়াছে বেশী, কিন্তু ঐ স্থানেই আমাদের যা কিছু গলদ, আমরা বুঝি অনেক বেশী—কিন্তু করিতে পারি না কিছুই, এ কথার প্রত্যক্ষ প্রমাণ সভাস্থলেই হইয়াছিল। সভাপতি মহাশয় কার্য্যারম্ভ জন্য অর্থ-তুলিবার প্রস্তাব করায় এক সভাপতি মহাশয় ব্যতীত কেহই কিছু দেন নাই। অন্ততঃ আমরা, যাহারা কংগ্রেসে বা সাহিত্যসভায় বা অন্যান্য সভায় পরকে যে বিষয় সম্পন্ন করিবার উপদেশ দিব, নিজ জীবনেও তাহা করিলে কতকটা সমাজের উপকার হয়। আমরা সব সময়ে তাহাও পারি না। কংগ্রেসের সামাজিক শাখায় বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে উক্ত শাখার জনৈক সভাপতির বক্তৃতা ও কার্য্যের বিষয় পাঠকদিগের সকলেরই সম্ভবতঃ স্মরণ আছে। এইজন্যই শশধর বাবু এক-স্থানে লিখিয়াছেন "অনেক বিষয়ের অনুশীলন করিবার উচ্চাশা এক্ষণে পরিত্যাগ করিয়া অল্পেই সন্তুষ্ট হওয়া উচিত।" এদেশের উন্নতির জন্য যাঁহারা প্রকৃত পক্ষে চিন্তা করেন, তাঁহারা সকলেই এ কথা বলিয়া আসিতেছেন, কিন্তু আমরা তাহা মানি কৈ? চতুর্দ্দশ কংগ্রেসের সভাপতি মহাশয় বহুদিন পূর্ব্বে বলিয়াছেন—

"We should select a limited number of subjects and devote our attention in the coming year, if need be in the years to come, towards carrying them out This will secure concentration, awaken greater interest and prevent frittering away of our not super-abundant energies."

অসমীয় সমাজের উন্নতির পথ নির্দ্দেশ করিতে হইলে, তাহার শিক্ষা, দীক্ষা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও পূর্ব্ব ইতিহাস জানা আবশ্যক। জীবতত্ত্বের এই মূল সূত্র অনুসরণ করিয়া শশধর বাবু অসমীয়দের পূর্ব্ব ইতিহাস যথাসাধ্য সুন্দররূপে আলোচনা করিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন যে, শঙ্কর দেবের পদাবলী ও বৈষ্ণব-সাহিত্যের সাহায্যে জ্ঞান-বিস্তারের চেষ্টা করিয়া অসমীয় ভ্রাতৃগণ অনার্য্যদিগের মধ্যে এখনও আর্য্য-প্রভাব বিস্তৃত করিতে পারেন। এ একটী সুন্দর উপদেশ—অসমীয় ভ্রাতৃগণ ইহা কার্য্যে পরিণত করিবেন কি? অসমীয় সম্বন্ধে ঐতিহাসিক যে সকল কথা লিখিত হইয়াছে, ইতিহাস হিসাবে তাহার মূল্য ও চমৎকারিত্ব খুব বেশী, কিন্তু অসমীয়গণের ভবিষ্যৎ-উন্নতির পথ নির্দ্দেশ করিবার উদ্দেশ্য উল্লেখেই এই ঐতিহাসিক তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে—সে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। অসমীয়দের বংশবৃদ্ধির

হার অত্যন্ত কম হইয়াছে। সুতরাং চিন্তার বিষয় উপস্থিত হইয়াছে। জীবতত্ত্ব চায়, মানুষ যত বৃদ্ধি হয় ততই ভাল, কারণ মানুষই সমাজের সম্পত্তি। এক্ষণে যেরূপ কাল পড়িয়াছে, যেরূপ আহার-সংগ্রহের কাঠিন্য উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে মানুষের দুই একটী পুত্রকেও অন্ততঃ অবস্থা অনুসারে সুশিক্ষিত করা উচিত। যে দুই একটী পুত্র পিতৃ-সম্পত্তি দ্বারা স্বচ্ছন্দে প্রতিপালিত হয়, কেবলমাত্র সেই দুই একটী পুত্রই মানুষ চায়। আর যদি সুযোগ্য, সবল ও সুস্থমন মানব দ্বারা সমাজ-গঠন আবশ্যক হয়, যদি দুর্ব্বল, পীড়িত ও দুষ্টপ্রকৃতির লোকের বিলোপ করা আবশ্যক হয়—যদি অযোগ্যের সহিত বিবাহ বন্ধ করা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে কোন নির্দ্দিষ্টসময়ে জনসংখ্যা কম হইবারই সম্ভাবনা। ফলতঃ পূর্ব্বে বংশবৃদ্ধির কি অনুপাত ছিল, এখনই বা কত হইয়াছে, তাহার কারণই বা কি, সে সকল কারণ কেবলমাত্র জীবতত্ত্বের আলোচনায় অপসৃত হইবে কি তজ্জন্য অন্যান্য বিজ্ঞানের আলোচনাও আবশ্যক, এ সকল বিষয়ে বিস্তৃত ও পূর্ণ আলোচনা প্রয়োজনীয়। নতুবা কিছুই স্থির করা চলে না। শুধু যে আমাদের দোষেই আমাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হইতেছে, তাহা নহে; কতকটা দেশের দোষেও আমাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হইতেছে। পূর্ব্বে এই দেশেই বহু অত্যাচার করিয়াও মানুষ অসুস্থ হয় নাই, এক্ষণে চরম সাবধানে থাকিয়াও অসুস্থ হইতেছে। আমাদের শরীর ক্রমে দুর্ব্বল হওয়াতেও যেরূপ অসুস্থতা বৃদ্ধি হইতেছে, ক্রমে দেশের স্বাস্থ্য খারাপ হওয়াতেও তদ্রূপ অসুস্থতা বৃদ্ধি হইতেছে। এইজন্যই বলি, এ রোগের প্রতিকার জন্য জীবতত্ত্বের সঙ্গে ভূতত্ত্বেরও বুঝিবা আলোচনা আবশ্যক হইবে। যাহাতে স্থানের স্বাস্থ্য নৈসর্গিক কারণে ক্রমে নষ্ট না হয়, তদ্বিষয়ে আলোচনা করিতে হইবে। সমাজের সম্বল মানুষ, মানুষের সম্বল সুস্থ দেহ ও সুস্থ মন। তাহার রক্ষার জন্য যখন যে শাস্ত্রের আলোচনা আবশ্যক হইবে, তাহাই করিতে হইবে।

তরল সাহিত্য সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। তিনি একস্থানে বলিয়াছেন, "কাব্য, নাটক, নবন্যাস, গল্পগুচ্ছ, এ সকলও অনুশীলনীয়, ইহারাও মনোবিজ্ঞানের, ইহারাও সমাজতত্ত্বের অংশ ভাবে আলোচিত হইতে পারে।" কথাটা ঠিক, কিন্তু কেবল utilityর উগ্র দণ্ড সম্মুখে রাখিয়া সাহিত্যের আলোচনা হইলে সাহিত্যের পূর্ণবিকাশ হয় বলিয়া আমাদের মনে হয় না। সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য সৃষ্টির জন্যও কাব্যের আবশ্যকতা আছে। এবং সেই উদ্দেশ্য মাত্র লইয়া সাহিত্য লিখিলে তাহার মধ্যেও আবশ্যকীয় অনেক বিষয়ই পাওয়া যায়। সম্পাদক মহাশয় স্পষ্টতঃ সে কথা না বলিলেও সম্ভবতঃ তাহা অস্বীকার করেন না।

শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় সম্প্রতি দুইটী বিষয় আলোচনা করিতে বলিয়াছেন, যথা, মানবতত্ত্ব-ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব। আমি বলিতে চাই, শিক্ষাতত্ত্বটাই সর্ব্বাগ্রে বিবেচ্য। আমরা যেভাবে শিক্ষা পাইতেছি, এই শিক্ষার মধ্যেই কি যেন কোথায় এমন একটু দোষ আছে যে, যাহাতে আমরা মানুষ হইতে পারিতেছি না। শিক্ষাতত্ত্ববিৎ লক সাহেবের কথায় বলিতে হইলে "আমরা সুস্থদেহ, সুস্থমন-সম্পন্ন ব্যক্তি" হইতেছি না। আমরা যাহা বুঝি ও বলি, তাহা করি না, যাহা বুঝি না ও করি না, তাহা বলি। সুতরাং শিক্ষাতত্ত্বের পূর্ণ আলো-

চনাই দেশের পক্ষে এক্ষণে প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য।

পাশ্চাত্য শিক্ষা তত্ত্বের প্রবল বন্যা, প্রাচ্য শিক্ষাতত্ত্ব-তরীকে প্রায় নিমজ্জিত করিয়া তুলিয়াছে; দুই শিক্ষা তত্ত্বের সুন্দর ও শোভন সমাবেশ করিয়া কিরূপে জাতীয় শিক্ষার পূর্ণতা লাভ হইতে পারে, তাহাই এক্ষণে আমাদের প্রধান বিবেচ্য। আমরা মানুষ না হইলে, মানবতত্ত্বের আলোচনাই হউক বা ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বের আলোচনাই হউক, কিছুতেই আমাদের পূর্ণ উন্নতি হইবে না। আমরা পণ্ডিত হইব, তার্কিক হইব, সমস্তই বুঝিব, সমস্তই বুঝাইব, কিন্তু করিব না কিছুই। ভাব ব্যতীত কর্ম্ম হয় না, সত্য, কিন্তু পূর্ণ মনুষ্যত্ব না জন্মিলে ভাব হইলেও কর্ম্ম হয় না। আমরা নিজেই ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এই জন্যই বলিতে চাই, শিক্ষাতত্ত্ব আলোচনাই দেশের পক্ষে সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য। শিক্ষা তত্ত্বের পূর্ণ আলোচনা করিতে হইলে, মানব তত্ত্ব এবং ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বেরও আলোচনা সম্যক আবশ্যক, সন্দেহ নাই।

সভাপতি মহাশয় বঙ্গদেশে এক নূতন ভাবের ডঙ্কা বাজাইয়াছেন। যে যে বিষয়ে কেন আলোচনা না করুন, মুখ্যতঃ মানবের মঙ্গল নির্দ্দেশ করিবার জন্য তাহা করা কর্ত্তব্য। সাহিত্য-ভাব-বীণা এই সুরেই বাঁধিতে হইবে; অন্য উপায় নাই।

শ্রীভবানীগোবিন্দ চৌধুরী।

নববর্ষ।

তোমায় মত নূতন বছর আস্‌ছে গেছে কত,
এম্‌নি তর বুক বেঁধেছি আশায় শত শত।
গলায় বেঁধে বুকের বাঁধন কাঁদন হল সার,
হাসির বদল ভারত ভরা ফাঁসির হাহাকার।

কালচক্রে বিশ্বরাজ্যে স্ব-তন্ত্র-শাসন,
বিরচিত বিশ্বপতির নিয়ম পুরাতন।
অন্ধ ভারত বন্ধ আঁখি চোখ্ মেলে না চায়,
সব গ্রহের শাসন-যন্ত্র নূতন পত্রিকায়।
সৌর-রাজ্যে গৌরবের কি শাসন পরিষদ্,
আত্মনিষ্ঠ স্বপ্রতিষ্ঠ সৌভাগ্য সম্পদ!
কোন্ বিভাগে কেবা মন্ত্রী রাষ্ট্রপতি হন,
নূতন হর্ষে নূতন বর্ষে নূতন নির্ব্বাচন!
রাহু কেতুর উপদ্রবে উল্কা তারাপাতে,
মুখ থুবড়ান কল্পে কল্পে আঘাতে সংঘাতে,
হউক ছাই হউক ভস্ম হউক রেণুকণা,
হয় যা রুদ্র আত্মবুদ্ধ চৈতন্য—চেতনা,
কি অচ্ছেদ্য ভ্রাতৃভাব, প্রীতির আকর্ষণ,
ছোট বড় পরস্পরে অভেদ আত্মা মন।
কেমন উদ্যম! কেমন উত্থান। কেমন অভ্যুদয়।
একাগ্রতা একপ্রাণতায় কেমন চির জয়।
কি আদর্শ নব বর্ষ কর প্রদর্শন।
রুদ্ধ শিরায় ক্রুদ্ধ রক্ত স্বপ্নে করে রণ

৩

মরতে হবে—মরব তাহে ক্ষতি কিছু নাই,
পচা মরণ দিওনা আর তাজা মরণ চাই।
সিংহ মরে ব্যাঘ্র মরে মহিষ মরে বনে,
বন্য পশুর ধন্য জীবন আত্ম-সমর্পণে।
ক্ষুদ্র পোকা সেও মরে রুদ্র পিপাসায়,
জ্বলন্ত আগুনে সেও আলোর মরণ চায়।
মানুষ আমি মরব নাকি অন্ধ কারাগারে,
কাপুরুষ পাতকীর মত চরণ প্রহারে?
ব্যোমের মত বক্ষ চাহি দিগ্ দিগন্ত খোলা,
জ্বলন্ত জ্যোতিষ্কের মত চাই সে গুলি গোলা
কালান্ত ভায় তেজের ছটা জ্বলন্ত প্রলয়,
মৃত্যু মরা মৃত্যু চাহি জীবন-জ্যোতির্ম্ময়।

লহ বর্ষ বক্ষ ভরা লক্ষ অঙ্গীকার,
অপূর্ণ আনন্দ শূন্য আকুল উপহার।
জীর্ণ অস্থি শীর্ণ মাংস মর্ম্ম গ্রন্থি ছিঁড়া,
ক্ষুৎপিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ রক্তশূন্য শিরা,
রোগে ক্লিষ্ট পদে পিষ্ট হা অদৃষ্ট লীলা।
পাঁজর ভাঙ্গা রক্তে রাঙ্গা লেও সে ফাটা পীলা।
শক্তিশূন্য হস্ত পদ ভক্তি-শূন্য প্রাণ,
চর্ম্ম মর্ম্ম-স্পর্শ-শূন্য—আঘাত অপমান,
আশা ইচ্ছা যোগ তপস্যা কর্ম্ম ধর্ম্ম সহ,
ইহকাল পরকাল আমার সকল লহ লহ।
লহ পুত্র লহ কন্যা লহ ভগ্নী ভাই,
অভিমন্যুর মত বর্ষ অভয় মৃত্যু চাই।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস

প্রসাদী ফুল। (২)

ভাব-সন্ধি।

বয়ঃসন্ধি যেরূপ, ভাবসন্ধিও সেইরূপ নিগূঢ় বিষয়। বয়ঃসন্ধি অনেক পরিমাণে বাহ্যেন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ, কিন্তু ভাব-সন্ধিকে বুঝিতে হইলে অন্তরে প্রবেশ করিতে হইবে।

যাঁহারা নদী কিম্বা বড় খালে জোয়ার ভাঁটার খেলা মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে বয়ঃসন্ধি ও ভাবসন্ধির প্রণালী বুঝা অপেক্ষাকৃত সহজ। পূর্ণ জোয়ারের পরে যখন ভাঁটা আরম্ভ হয়, তখন দুই-আনা আন্দাজ ভাঁটা সরিয়া গেলেও উপরের জল ফিরে না। নদীর তটের দিকে চাহিয়া দেখ, জল অনেকটা কমিয়াছে, কিন্তু তখনও স্রোত ফিরে নাই, জোয়ারে যে দিকে যাইতেছিল, সেই দিকেই জলের টান রহিয়াছে; ইহার পরে জল গতিহীন হইয়া স্তব্ধভাব অবলম্বন করিবে, পূর্ব্ব বঙ্গের মাঝিরা ইহাকে "দুমুড়ি" বলে, কালিদাসের ভাষায় ইহাকে "নদ্যৌ নতস্থৌ" বলা যাইতে পারে। "এই দুমুড়ির পরে যখন জলের গতি হয়, তখনই ভাঁটার টান পড়ে, অর্থাৎ স্রোত বিপরীত দিকে বহিতে থাকে। জোয়ারের পরে যেমন দুমুড়ি হয়, ভাঁটার পূর্ণাবস্থায়ও ঠিক সেইরূপই হইয়া থাকে, জোয়ার আরম্ভ হইয়া যখন দুই আনা পরিমাণ জলবৃদ্ধি হয়, তখনও, উপরের জলের টান ফিরে না, দুমুড়ি হইয়া যখন স্রোত ফিরে, তখন নদীর কিনারার দিকে চাহিয়া দেখিবে, জল অনেকটা বাড়িয়া গিয়াছে, অনেক পূর্ব্বে জোয়ার আসিয়াছে, কিন্তু উপরের স্রোত ফিরে নাই। জোয়ার ভাঁটার এইরূপ লীলাখেলার সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, বয়ঃসন্ধি ও ভাবসন্ধির লীলা-খেলাও এইরূপই।

লোকেরা সচরাচর যাহাকে পূর্ণ কৈশোর বলে, তখন তাহাতে দুই আনা যৌবন প্রবেশ করিয়াছে, ভিতরে ভিতরে একটা বিশেষ পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু বাহিরের আকৃতিতে তখনও উহা ধরা পড়ে নাই। এই অবস্থার বর্ণনা করিতে যাইয়াই সূক্ষ্মদর্শী বৈষ্ণব কবি বলিয়াছেন, "কৈশোর যৌবন দরশন ভেল, দুহুঁ দলবলে ধনী দ্বন্দে পড়ি গেল", যৌবন তখনো বাহ্যেন্দ্রিয়ে প্রকাশ পায় নাই, কিন্তু নয়নের চাহনীর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, লজ্জা শরম আসিয়া উঁকি-ঝুঁকি মারিতেছে "কভু উধারয় অঙ্গ কভু থোলে গাত।" কিন্তু ভাঁটা যেমন জোয়ারকে সহজে স্বীকার করিতে চাহে না, সেইরূপ, কৈশোরও আপনার পূর্ণাধিকার অস্বীকার

করিতে চাহে না, যৌবনের যে ভাবটুকু আসিয়া পড়িয়াছে, সে টুকুকে আপনার অধিকারের মধ্যে মিলাইয়া লইতে চাহে। ভাব-সন্ধির বেলায় যখন পুরাতন ভাবের মধ্যে নূতন ভাব আসিয়া পড়ে, তখন পুরাতন নূতনকে সহজে স্বীকার করে না, একটা রেষারেষির মধ্যে পড়িয়া নূতনের আধ্যাত্মিক বা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়া উহাকে আপনার মধ্যে সামলাইয়া লইতে চায়। কিন্তু নূতন যখন পূর্ণজোরে বানের জোয়ারের মত আসিয়া পড়ে, তখন পুরাতন সম্পূর্ণরূপে তাহাতে আত্ম সমর্পণ করে। তখন আর দোটানা ভাব থাকে না, সুতরাং বৈজ্ঞানিক কি আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না।

হরিরাম নীতিকেই পূর্ণ ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করেন। কিন্তু সৎকার্য্যকে অকপটভাবে জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া গ্রহণ করায় ক্রমে ক্রমে তাঁহার চিত্ত নির্ম্মল হইতে থাকিবে এবং চিত্তের নির্ম্মলতা লাভের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাতে পারলৌকিক বিশ্বাস ও ঈশ্বর-বিশ্বাসের একটা আভাস আসিয়া পড়িবে। হরিরাম সহজে সে বিশ্বাসকে আমল দিতে চাহিবে না, কিন্তু স্বাভাবিক নিয়মানুসারে তাহার ধর্ম্ম কথা শুনিতে ভাল লাগিবে, তীর্থ-পর্য্যটনে আনন্দ হইবে, সাধুসঙ্গের লালসা জন্মিবে। হরিরামকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিবেন, "ও সব কিছু নয়, ঐরূপ নানাপ্রকার সৎকথা শ্রবণ, নানাদেশ ভ্রমণ ও সাধুদিগের সঙ্গ করিলে মানসিক বলবৃদ্ধি পায় এবং নৈতিক জীবন উন্নত হয়, সৎকার্য্য করিতে প্রবৃত্তি জন্মে, এই জন্যই ঐ সকলের দরকার, বস্তুতঃ নীতির ধর্ম্মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।" হরিরাম বুঝিতে পারেন নাই যে, তিনি ভাব-সন্ধিতে পড়িয়াছেন, তাঁহার জীবন-হ্রদে নূতন ভাবের জোয়ার আসিয়াছে। কিছু দিন পরে দেখিবে, হরিরাম পূজাপাঠ লইয়া ব্যতিব্যস্ত, তাঁহার কর্ম্ম করিবার অবসর বড়ই কম, জিজ্ঞাসু হইয়া তিনি বলিবেন "ওহে প্রীতি না হইলে কি প্রিয় কার্য্য হয়? শুধু সুগৃহিণী হইলে কি হইবে? পতিপ্রাণা হওয়া চাই।" এই সময় হরিরামের হৃদয়-নদীতে পূর্ণবেগে ধর্ম্মের জোয়ার আসিয়াছে, এখন আর নীতিবাদের সঙ্গে মিলাইয়া ধর্ম্ম কার্য্যগুলির অন্য ব্যাখ্যা দেওয়া চলে না, এখন পূর্ণ জোয়ারের পূর্ণ যৌবন।

এইরূপে এক একটী স্তর অতিক্রম করিয়া অন্যস্তরে প্রবেশ করিবার সময় এক একটী ভাব-সন্ধিকে অতিক্রম করিতে হইবে, এক একটী দুমড়ির ভিতর দিয়া যাইতে হইবে। দ্বিতীয় স্তরকে যেরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম মনে হইয়াছিল, অন্য স্রোত আসিয়া পড়ায় ক্রমে ক্রমে সে বিশ্বাস লইয়া তেমন গোঁড়ামী করা চলিবেনা, এই সময় সমস্ত সৃষ্টিকার্য্যের মধ্যে কারণ ব্রহ্মকে অনুভব করিয়া তাঁহারই পূজায় প্রবৃত্তি জন্মিবে, এবং এখানেও প্রথম প্রথম উভয় পক্ষকে মিলাইবার জন্য, একটী যে কোনরূপ ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইবে। এই নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল জগতে মানুষ আপনার ধর্ম্ম-মতকে অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়া প্রমাণিত করিতে চায়, অধিকাংশ মনুষ্যের চরিত্রের মধ্যেই এই ভাব বিদ্যমান্ রহিয়াছে, কেহই ইহার হাত হইতে অব্যাহতি পায় না। পুরাতন বস্তু, যাহাকে শত সাধনে পাওয়া গিয়াছে, তাহাকে একান্ত শত্রুর ন্যায় উপেক্ষা করা মানব হৃদয়ের স্বধর্ম্ম নহে, তাই পরিবর্ত্তন আসিয়া পড়িলে তাহাকে যথাসাধ্য পুরাতনের ঘরে আশ্রয় দেওয়ার চেষ্টা করা মানবের স্বধর্ম্ম।

এই ভাব-সন্ধির তাৎপর্য্য যাহারা বুঝিতে পারে না, তাহারা ধর্ম্মের বিকাশকে ধর্ম্মের বিকার বলিয়া মনে করে, তাহারা পরিবর্ত্তনের মধ্যে বিকাশের ক্রম দেখিতে পায় না।

মতান্তর ও মনান্তর।

একই ধর্ম্মের যদি বিভিন্ন স্তর, তবে বিভিন্ন স্তরের সাধকদিগের মধ্যে মতান্তর এবং মনান্তর ঘটে কেন? ইহার উত্তর আছে। গোমুখীতে গঙ্গা অতিশয় অপ্রশস্থা একটী খরস্রোত মাত্র, উভয় পার্শ্বের শিলাখণ্ড সকল সরাইয়া নির্জ্জন পথে অভ্রভেদী পর্ব্বত-শৃঙ্গের মধ্য দিয়া প্রকাণ্ড অজগরের ন্যায় অবিরাম তীব্রগতিতে নিম্নদিকে ছুটিয়াছে। সেই গঙ্গা,প্রয়াগের সমতল ভূমিতে আসিয়া, উভয় পার্শ্বস্থ ক্ষেত্ররাজীকে শ্যামল শস্যে পরিশোভিত করিয়া সুপ্রশস্ত প্রবাহিণীরূপে আপনার সৌন্দর্য্য-প্রভায় আপনি মুগ্ধ হইয়া দক্ষিণবাহিনী হইয়াছে। গোমুখীর চঞ্চলা বালিকা প্রয়াগে যৌবন-শ্রী ধারণ করিয়া, আপনার আবেগ আপনাতে সম্বরণ পূর্ব্বক মৃদুমন্দভাবে চলিয়াছে। কলিকাতায় আবার ভিন্নশ্রী; এখানে অতুল ঐশ্বর্য্যের মুকুট মাথায় পরিয়া, ঘোরতর সাংসারকোলাহলের মধ্য দিয়া রাজরাজেশ্বরীরূপে সাগর-সঙ্গমে ছুটিয়াছে। গোমুখী হইতে সাগর-সঙ্গম পর্য্যন্ত একই স্রোত, কিন্তু বাহ্য লক্ষণ কিরূপ বিসদৃশ! কোথাও অত্যুন্নত পর্ব্বত শ্রেণী,কোথাও শ্যামল সমতল ক্ষেত্র, কোথাও জন-কোলাহলপূর্ণ মহানগরী, কোথাও শ্বাপদাকীর্ণ ভীষণ অরণ্যের মধ্য দিয়া এই স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। কোথাও ঋজু, কোথাও কুটিল, কোথাও সঙ্কীর্ণ, কোথাও প্রশস্তভাবে বিভিন্ন অভিমুখে ইহার গতি হইয়াছে। কোন এক ব্যক্তিকে গোমুখীতে গঙ্গা দেখাইয়া যদি প্রয়াগে আনিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়, সে কখনও বুঝিতে পারিবেনা যে, এই সকল স্থানেই সেই একই নদী। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি গোমুখীর স্রোতে অবগাহন করিয়া বরাবর সেই স্রোতেই ভাসিয়া ডুবিয়া আইসে, তবে বাহ্যিক সহস্র পরিবর্ত্তনের মধ্যেও তাহার কখনও সন্দেহ হইবে না যে, এই সমস্ত একই স্রোত কি না? সেই প্রকার মানুষ যতদিন ধর্ম্মরাজ্যে তর্কের শুষ্ক পথে চলে, বাহিরের কতকগুলি পার্থক্য, কতকগুলি মতামতের বিভিন্নতা দেখিয়া সে মনে করে, এই সকল ধর্ম্মই ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু যখন অন্তর-নিহিত একটী নিগূঢ় ভাব-স্রোতে আপনাকে ভাসাইয়া দিতে পারে, তখন সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে এক আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য দেখিতে পায়, সমস্ত বিবাদের একই মিলনে পরিণতি হয়। তখন মত লইয়া সম্প্রদায় হয় না, এবং অলক্ষ্য সাংসারিকতা-মিশ্রিত স্বদলবদ্ধ সঙ্কীর্ণ মত লইয়া প্রেম আর গণ্ডীর মধ্যে থাকে না। হৃদয় এমন একটী উদার ভূমি প্রাপ্ত হয় যে, সকল সম্প্রদায়, সকল দলকেই সেখানে সযত্নে বসাইতে পারে। আমার মত যে বিশ্বাস করে না, সে সুবোধ নহে, এবং আমার আচরণের ন্যায় যে আচরণ করে না, সে ধার্ম্মিক নহে, এইরূপ দূষিত-জ্ঞান তখন বিদূরিত হয়। যে সাধক সাধনার পথে চলিয়া নীতি হইতে স্তর পরম্পরা অতিক্রম করিয়া লীলার স্তরে উপস্থিত হন, তিনি নীতি, ধর্ম্ম, ব্রহ্মজ্ঞান ও যোগ, ইহার কাহাকেও অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করিতে পারেন না, যৌবন যেমন বাল্য কৈশোরকে অস্বীকার করিতে পারে না, বৃক্ষের পুষ্প ও ফল যেমন কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখাকে উপেক্ষা করিতে পারে না, সেইরূপ, পঞ্চমস্তরের সাধকগণও নিম্নস্তরগুলিকে অস্বীকার বা উপেক্ষা করিতে পারেন না,

পরন্তু ঐ সকল স্তরই তাঁহার উচ্চতম সাধনার ভিত্তি, ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিয়া অধিকারীভেদে ঐ সকল স্তরের উপযোগী সাধকদিগকে তাহাদের অবলম্বিত পথে চলিতে যথেষ্ট উৎসাহ ও সাহায্য প্রদান করিয়া থাকেন।

কিন্তু যাঁহারা সাধন-পথে না চলিয়া কেবল বিতর্ক ও বিচার দ্বারা ধর্ম্মমত গ্রহণ করেন, তাঁহারা শুধু আপনার মতটীকেই একমাত্র ধর্ম্মসাধনের উপায় বলিয়া বুঝেন এবং তাহার উপরে কিম্বা নীচে যাহা কিছু আছে, সে সকলকে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করেন। কেহ বলেন, নীতিই সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্ম, অন্য সকল কুড়েমী ও কুসংস্কার মাত্র; কেহ বলেন,সাকারের উপাসনা হয় না; কেহ বলেন, নিরাকারের উপাসনা হয় না; কেহ কেহ বলেন, ব্রহ্ম কিছু নহে; কেহ বলেন, যোগী কিছু নহে; কেহ বলেন; লীলা কুসংস্কারের ও ভ্রান্তি দর্শনের ফল; আবার কেহবা বলেন, লীলা ভিন্ন আর কিছু কিছুই নহে ও সবগুলি নিম্নাধিকারীর জন্য, এইরূপ যত মতান্তর ও মনান্তর, সে সকলই বাহিরের বিচার-বুদ্ধিরই ফল।

সাধকদিগের মধ্যেও যে মতান্তর না ঘটে, তাহা নহে। যিনি যে স্তরের সাধক, সেই স্তরই তাঁহার নিকট সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া মনে হয়। এ বিষয় ভক্তি-বিজ্ঞানের প্রসিদ্ধ লেখক কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

"যার যেই ভাব তার সেই সর্ব্বোত্তম,
তটস্থ হইয়া বিচারিলে আছে তর তম।"

তটস্থ হইয়া বিচার করিলে ভাবের মধ্যে উৎকৃষ্ট, উৎকৃষ্টতর ও উৎকৃষ্টতম ভাব আছে, কিন্তু যিনি যে ভাবের অধিকারী, তাঁহার পক্ষে সেই ভাবই "সর্ব্বোত্তম"। বস্তুতঃ যিনি যে ভাবে সাধন করেন, সেই ভাবকে "সর্ব্বোত্তম" জ্ঞান না করিলে তাঁহার সেই সাধনের প্রতি পূর্ণশ্রদ্ধা হয় না, সুতরাং তাঁহাতে তাহার সিদ্ধিলাভও হয় না, কিন্তু তিনি যদি আপনার সাধন পথকেই একমাত্র পন্থা মনে করেন, তবেই গোঁড়ামী আসিয়া পড়ে এবং অন্য মতাবলম্বীর প্রতি বিদ্বেষ জন্মে, সুতরাং মতান্তরে মনান্তর উপস্থিত হয়। হিন্দুশাস্ত্র, অধিকারীভেদের কথা বলিয়া, ধর্ম্মসাধকদিগকে ধর্ম্মবিদ্বেষের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

শ্রীগুরুদেব নিজে এই পঞ্চস্তরের ভিতর দিয়া আপনাকে প্রকাশিত করিয়াছেন, সমস্ত স্তরগুলির একটীর পর একটী সাধন করিয়া প্রত্যেক স্তরে আপনার অসাধারণ তপস্যার ফল প্রকাশিত করিয়াছেন। তাঁহার বাল্যের নীতি, কৈশোরের ধর্ম্মচর্য্যা,যৌবনের ব্রহ্মজ্ঞান, প্রৌঢ়ের যোগসাধন এবং শেষ জীবনের লীলা-মাধুর্য্য, প্রত্যেকে স্তরের সাধকের জন্য আদর্শ হইয়া রহিয়াছে এবং তাঁহার সমস্ত জীবনে সমস্ত ভাবেরই সামঞ্জস্য রহিয়াছে। সে জীবনে ব্যাকুলাত্মা সাধক যাহা চাহিবেন, তাহাই পাইবেন। তিনি পাঁচটী বাগান হইতে পাঁচ রকমের পাঁচটী ফুল কুড়াইয়া আনিয়া একটী পাঁচ ফুলের তোড়া গঠন করেন নাই, সমস্ত ফুলগুলিই তাঁহার হৃদয়-ভূমিতে সাধন-সলিল-সিঞ্চনে সত্যের বীজ হইতে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। তিনি আমাদিগকে ধর্ম্ম-বিদ্বেষের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

ভাব-স্থিতি।

মতান্তরের আর একটা কারণ "ভাব-স্থিতি"। শ্রীমৎভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

"মনুষ্যানাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে
যততা মপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ।

সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে কদাচিৎ কোন এক ব্যক্তি সিদ্ধি লাভের জন্য যত্ন করে, সেই রূপ, যত্নসিদ্ধ লোকদিগের মধ্যে কদাচিৎ

কোন ব্যক্তি আমাকে তত্ত্বতঃ জানিতে পারে।

বস্তুতঃ সাধকদিগের মধ্যেও কদাচিৎ কোন ব্যক্তি উচ্চতম অবস্থা (১) লাভ করেন, অধিকাংশ সাধকই কোন না কোন স্তরে সমগ্র জীবন অতিবাহিত করেন। কেহ নীতিতে, কেহ ধর্ম্মকর্ম্মে, কেহ ব্রহ্মজ্ঞানে ও কেহ যোগে অবস্থিতি করেন, কদাচিৎ কোন ব্যক্তি লীলা সন্দর্শনের অধিকারী হন।

যিনি যে স্তরে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন, সেই স্তরের অধিকারিগণ তাহার অনুগত হইয়া থাকে। সুতরাং সকল স্তরের মহাত্মাদিগেরই অসংখ্য চেলা জুটিয়া যায়, কেননা লোকের রুচি বিভিন্ন। সকল স্তরের প্রতিষ্ঠার জন্যই শাস্ত্র ও মহাপুরুষের প্রয়োজন, যে দেশে বা যে জাতির মধ্যে যে ভাব প্রচারিত হওয়া আবশ্যক, সেই দেশবাসিগণ কিম্বা সেই জাতীয় লোকেরা সেই ভাবে আকৃষ্ট হইয়া কোন শাস্ত্র বা কোন মহাপুরুষকে অবলম্বন করিয়া এক একটী স্বতন্ত্র ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি করে। যেমন প্রধানতঃ নীতি লইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম, একেশ্বরবাদ লইয়া ইহুদী ও মুসলমান ধর্ম্ম, অবতারবাদ লইয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম এবং সকল প্রকার ধর্ম্ম লইয়া হিন্দু ধর্ম্ম। (২)

"ভাব-স্থিতি" কাহাকে বলে? যে সাধক যে ভাবে অধিককাল অবস্থিতি করেন, অথবা ইহা জীবনের শেষকাল পর্য্যন্ত যিনি যে ভাব ধরিয়া থাকেন, উহাই তাঁহার ভাবস্থিতির অবস্থা। যাঁহার যে স্তরে ভাবস্থিতি হয়, সেই স্তরকেই তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করেন, উহা অপেক্ষা উচ্চতর কোন স্তরের কথা তিনি বুঝিতে পারেন না, সুতরাং উহার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। এজন্য কখন কখন প্রকৃত সাধকে সাধকেও মতান্তর ঘটে। সকলকেই যে ইহা জীবনে প্রথম স্তর হইতে পঞ্চম স্তরে যাইতে হইবে, এরূপ নহে, কদাচিৎ কোন ব্যক্তির জীবনে সেরূপ ঘটিয়া থাকে, কিন্তু হয় জন্মজন্মান্তরে অথবা লোক-লোকান্তরে সকলেরই সকল অবস্থা লাভ হইবে। তখন সমস্ত পার্থক্য ঘুচিয়া যাইবে। ইহ জীবনে যাঁহারা এই তত্ত্বের আভাস পান, তাঁহাদের মধ্যেও মতান্তরে মনান্তর ঘটে না।

এই প্রবন্ধে "ধর্ম্মজীবনের পঞ্চস্তরের" কথা বলিতে যাইয়া এই বিষয়ের সহিত যে যে বিষয়ের বা ভাবের সম্বন্ধ আছে, সেই সকল কথা বলিতে চেষ্টা করিয়াছি। পাঠকের মনে যে সকল সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে, সে সকলের মীমাংসার জন্য সংক্ষেপে যতটুকু ইঙ্গিত করা যায়, তাহাই করিতে চাহিয়াছি, এবং এইজন্যই "বিচিত্রতার বিরোধ নাই" "ভাবসন্ধি" "মতান্তর ও মনান্তর" "ভাবস্থিতি" প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ করিতে হইয়াছে, উদ্দেশ্য সাধনে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, বলিতে পারি না। বিষয়টী অত্যন্ত জটিল এবং প্রচলিত ধর্ম্মচিন্তা হইতে একটু ভিন্ন আচারের বস্তু, কাজেই আমাকে বিশেষ সঙ্কোচ বাধিতে হইয়াছে। যদি কোন ভাব-প্রকাশ করিতে অক্ষম হইয়া থাকি, সে সমস্ত অপরাধই আমার; কেননা ব্যাখ্যার ভার আমিই গ্রহণ করিয়াছি। শ্রীমনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা।

---

(১) ভগবানের অনন্ত লীলা, ধর্ম্মেরও অনন্ত স্তর আছে, তবে ইহলোকে সাধক জীবনে তাহার যে সর্ব্বোচ্চ প্রকাশ দেখা যায়, তাহাকেই "উচ্চতম অবস্থা" বলা হইল।

(২) বস্তুতঃ "হিন্দুধর্ম্ম" নামে কোন ধর্ম্ম নাই, এমন কি, প্রাচীন গ্রন্থে "হিন্দুজাতি" বলিয়া কোন জাতিরও উল্লেখ নাই। বর্ত্তমানে হিন্দু বলিতে যাহাদিগকে বুঝায়, তাহাদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের যে সকল ধর্ম্মমত প্রচলিত আছে, এস্থানে সেই সকলেরই নামই হিন্দুধর্ম্ম রাখা হইল। ভারতীয় আর্য্যজাতি ধর্ম্মকে ধর্ম্মই বলিতেন, উহা বিশ্বজনীন ধর্ম্ম।

স্বপ্ন। (৩)

দূরস্থ সত্য ঘটনা স্বপ্নে দর্শন করিতে হইলে একজন সেই স্বপ্নের প্রেরক ও একজন গ্রাহক আবশ্যক। পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা প্রেরকের বিষয় আলোচনা করিয়াছি। তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, স্বপ্নে দূরদৃষ্টি করিবার নিমিত্ত একটী বিশেষ বৃত্তিই সম্ভবতঃ মানুষের আছে। আর সেই বৃত্তি স্থূল-দেহে অধিক স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয় না, স্থূল-দেহের সহিত আত্মার বিচ্ছেদ ঘটিলেই এই বৃত্তি স্ফূর্ত্তিলাভ করে। এক্ষণে গ্রাহকের অর্থাৎ স্বপ্নদর্শকের বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক। দূরস্থ সত্য ঘটনা যখন অধিকাংশ সময়েই স্বপ্নে দৃষ্ট হইয়া থাকে, তখন স্বপ্ন সম্বন্ধেই আলোচনা করা আবশ্যক। তাহা হইলে বুঝা যাইবে যে, স্বপ্নে ঐরূপ ঘটনার অনুকূল কোন কারণ বিদ্যমান থাকে কি না।

স্বপ্নানুভূতি অনেকবার পরীক্ষিত হইয়াছে। স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বিশ্বস্তরূপে লিপিবদ্ধ থাকিলে তাহার আলোচনা দ্বারা, এবং নিদ্রিত ব্যক্তির উপর পরীক্ষা করতঃ এই বিষয় বিবেচনা করা হইয়া থাকে। নিদ্রিত ব্যক্তির দেহ স্পর্শ করিয়া কিম্বা তাহার নিকট কোন শব্দ করিয়া তাহাকে জাগাইলে পর, যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, "আপনি কোনও স্বপ্ন দেখিয়াছেন?" তাহা হইলে অধিকাংশ স্থলে স্বপ্ন না দেখাই জানা যায়। কিন্তু কখন কখন তিনি স্বপ্ন দেখাও বলিয়া থাকেন। ফরাসী পণ্ডিত ডুপ্রেল স্বীয় গ্রন্থে নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। নিদ্রিতের ঘাড়ে স্পর্শ করায় সে জাগিয়াছিল, তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়। তাহাতে সে এইরূপ বলিয়াছিল;—

"আমি স্বপ্ন দেখিলাম যে, আমি একটী নরহত্যা করিয়াছি, আমার বিচার হইতেছে। ব্যারিষ্টারেরা বক্তৃতা করিতেছে। জজ সাহেব জুরিদিগকে বুঝাইয়া দিতেছেন। পরে আমি দোষী সাব্যস্ত হইলাম, এবং আমার প্রাণ দণ্ডের আদেশ হইল। আমাকে গারদে লইয়া গেল। সেখানে আমাকে অনেক দিন অপেক্ষা করিতে হইল। তৎপর আমাকে মশানে লইয়া গেল, এবং যেমন গিলোটিন্ যন্ত্রের ছুরি আমার গলদেশে পতিত হইল, অমনি আমি জাগিয়া উঠিলাম।"

ষ্টিফেনস্ নামক একজন জার্ম্মাণ গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে—"আমি ও আমার ভ্রাতা শুইয়া ঘুমাইতেছিলাম। আমি স্বপ্ন দেখিলাম যে, আমি এক নির্জ্জন রাস্তার উপর আসিয়াছি, আর এক হিংস্র জন্তু আমাকে পিছে পিছে তাড়া করিয়া আসিতেছে। আমি প্রাণের ভয়ে দৌড়াইতেছি, কিন্তু চীৎকার করিতে পারিতেছি না। হঠাৎ সম্মুখে সিঁড়ি দেখিলাম, অমনি ঐ সিঁড়ির উপর উঠিতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু দৌড়াইতে দৌড়াইতে আমি এত ক্লান্ত হইয়াছিলাম যে,আর বেশী না উঠিতেই ঐ হিংস্র জন্তু আমাকে ধরিয়া ফেলিল এবং আমার উরুতে কামড়াইল। তখনই এক চীৎকার করিয়া আমি জাগিয়া উঠিলাম। আর জানিলাম যে, আমার ভ্রাতা আমার উরুতে চিমটি কাটিয়াছিলেন।"

আর একজন জার্ম্মাণ লেখক বিচার্স

লিখিতেছেন যে, একজন লোক বন্দুক আওয়াজের শব্দ শুনিয়া জাগিয়াছিল, পরে তাঁহাকে, জিজ্ঞাসা করায় সে বলিয়াছিল যে "আমি স্বপ্নে সৈনিক হইয়াছিলাম, এবং কিছু দিন পরে আমার সৈন্য দল হইতে পলায়ন করিয়াছিলাম। কিন্তু আমাকে উহারা ধরিয়া ফেলিল এবং বিচার করিয়া প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা দিল। যেমন আমার দিকে গুলি করিয়াছে, অমনি আমি জাগিয়া উঠিলাম।"

এত ঘটনা ঐ বন্দুক আওয়াজের শব্দ করা মাত্রই তাহার স্বপ্নে ঘটিয়াছিল। এমন অনেক বৃত্তান্ত সংগৃহীত আছে, তাহা লিখিতে গেলে শেষ হয় না।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, স্পর্শ অথবা শব্দই উপরের লিখিত স্বপ্নগুলির মূল প্রবর্ত্তক, ঐ স্পর্শ অথবা শব্দ অনুভূত হইবার পর জাগ্রত হইবার পূর্ব্বে যে অত্যল্প সময় ব্যবধান ছিল, তাহারই মধ্যে ঐরূপ নানাবিধ ঘটনা-পূর্ণ স্বপ্ন দেখিবার কারণ কি? উহা কিরূপে সম্ভব হয়? ঐ শব্দ অথবা স্পর্শের কারণ অনুমান করিবার নিমিত্তই যেন ঐ সকল বিবিধ ঘটনা-পূর্ণ স্বপ্ন রচিত হইয়াছিল, অত্যল্প সময়ের মধ্যে এত ঘটনা-বৈচিত্র্য নিষ্পন্ন হইয়াছিল, আর যে শব্দ অথবা স্পর্শ স্বপ্নদর্শনের পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহাকেই স্বপ্নের শেষ পরিণামরূপে অনুভূত হইয়াছিল। শব্দ, অথবা স্পর্শের অনুভূতি স্নায়ুযোগে যেরূপ বেগে মস্তিষ্কে নীত হয়, তাহার পরিমাণ করা হইয়াছিল, সুতরাং তাহা অজ্ঞাত ছিল না। ঐ সকল বহু ঘটনা-পূর্ণ সুদীর্ঘ স্বপ্ন দেখিতে যে সময় আবশ্যক হইয়াছিল, তাহা ঐ স্নায়ুর বেগ অপেক্ষা অনেক অধিকতর বেগে না হইলে স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনাবলী দেখা সম্ভবই হইত না। সুতরাং স্নায়ুর বেগ অপেক্ষা ক্ষিপ্রতর বেগে অন্য কোন উপায়ে ঐরূপ স্বপ্ন দৃষ্ট হইয়াছিল। স্বপ্নে ঐ শব্দ অথবা স্পর্শের কারণ রচনা করিতে যে সকল ঘটনাকে পরস্পর ধারাবাহিক রূপে সংযুক্ত করিতে হইয়াছিল, তাহাতে এত অল্প সময়ের মধ্যে এত অধিক ঘটনাকে সন্নিবিষ্ট করিতে হইয়াছিল যে, স্নায়ুর বেগ তাহা করিতেই সক্ষম নহে। সুতরাং অন্য উপায়ে ঐ শব্দ অথবা স্পর্শ মস্তিষ্কে নীত ও অনুভূত হওয়া বিবেচনা করিতে হয়। তাহা হইলেই জাগ্রত অবস্থায় যে উপায়ে অনুভূতি সকল মস্তিষ্কে নীত হয়, স্বপ্নাবস্থায় তাহা হইতে পৃথক উপায়ে ঐ কার্য্য সাধিত হওয়া স্বীকার করিতে হয়। অতীন্দ্রিয় অনুভূতি স্বীকার করিলেই তন্নিমিত্ত পৃথক এক অজ্ঞাত বৃত্তির স্বীকার করা আবশ্যক হইয়া উঠে।

স্বপ্নানুভূতি জাগ্রত অনুভূতি অপেক্ষা অধিকতর সত্য বলিয়া তৎকালে প্রতীয়মান হয়। আর উহা ঘটনা পরম্পরার অভিনয় ব্যতীত কোন ভাব যেন গ্রহণ করিতেই সক্ষম হয় না, বলিয়া বোধ হয়। ইহার কারণ এই বিবেচনা হয় যে, সম্ভবতঃ স্বপ্নাবস্থায় অনুভূতি এক পৃথক অজ্ঞাত ইন্দ্রিয় যোগে সিদ্ধ হয়। যেমন জাগ্রত অবস্থায় দর্শনেন্দ্রিয় যোগে রূপ অনুভূত হয়, শ্রবণেন্দ্রিয়ের যোগে শব্দ অনুভূত হয়,তেমনি আমার মনে হয় যে, স্বপ্নানুভূতি যেন এক পৃথক ইন্দ্রিয়-যোগ-ঘটনা পরম্পরার অভিনয় রূপে বিকশিত হয়। উহা ঐ ভাবেই মস্তিষ্কে অনুভূত হইয়া থাকে, অন্য রূপে নহে। স্বপ্নাবস্থায় পৃথক কোন ইন্দ্রিয়যোগে অনুভব সিদ্ধ হওয়া স্বীকার করিলেই অতীন্দ্রিয়ানুভূতি স্বীকার করা হইবে।

ইহা অন্য প্রকারেও বুঝা যাইতে পারে, ইহার অর্থ অন্যভাবেও উপলব্ধি হইতে পারে।

কিন্তু আমি যেরূপে ইহার অর্থগ্রহ করিতে প্রয়াস করিতেছি, সকলে যদি তাহা স্বীকার নাও করেন, তথাপি এই সকল স্বপ্নদৃষ্ট বৃত্তান্ত অবিশ্বাস করিবার কোনই কারণ নাই। আমি যোগ ও আত্ম নিরোধ (mesmerism) বিষয়ে যে প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করিয়াছি, তাহাতে এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। উহা পূজ্যপাদ পিতৃদেব-কৃত পাতঞ্জল-যোগ-শাস্ত্রের ইংরাজী ভাষ্যগ্রন্থে পরিশিষ্ট রূপে প্রকাশিত হইয়াছে।*ঐ পরিশিষ্টে আমি দেখাইয়াছি যে মহর্ষি পতঞ্জল যোগাবস্থায় দেহ ও মনের বৃত্তি সকল নিরুদ্ধ হওয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আর তিনি এই অবস্থায় আত্মার স্বকীয় বৃত্তি সকল স্ফুরণ প্রাপ্ত হওয়া বিবেচনা করেন। আমি ঐ প্রবন্ধে ইহাও প্রতিপন্ন করিবার চেষ্ট করিয়াছি যে, আত্মনিরোধ সময়ে যে সকল ঘটনা সংঘটিত হয়, তাহার মীমাংসা দুঃসাধ্য হইলেও, মহর্ষির সিদ্ধান্ত অনুসারে তাহা দুর্ব্বোধ হয় না। স্বপ্নানুভূত ঘটনা কেবল যে আত্মনিরোধ সময়ের ঘটনার সহিত একভাবাপন্ন, তাহা নহে, উহা যোগাবস্থার সহিত অনেকাংশে সম-শ্রেণীর। জাগ্রতাবস্থায় আত্মাই শক্তিকেন্দ্র, আত্মাই প্রধান কর্ম্মী। কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় আত্মা প্রধানতঃ আধার স্বরূপ। আত্মার বহিরাবরণ-নিহিত শক্তি সকল ক্রিয়া করে, আত্মা সেই সকল অনুভবের ভাণ্ড মাত্রে পরিণত হয়।† তবেই স্বপ্নে দৈহিক ও মানসিক ক্রিয়াই যে কেবল নিরুদ্ধ হয়, তাহা নহে, যোগের ন্যায় এ অবস্থাতেও আত্মা দেহ ও মনের শৃঙ্খল হইতে অনেকাংশে মুক্ত হয়। মহর্ষি পতঞ্জলের মতানুসরণ করিলে ইহাই অনুমিত হয়। সুতরাং যোগাবস্থায় আত্মা যেরূপ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়, স্বপ্নেও তদ্রূপই হওয়া অতীব সম্ভবপর। মহর্ষির সিদ্ধান্ত অনুসারে উপরের লিখিত স্বপ্নানুভূতি ঘটনাবলীর মীমাংসা হইতে পারে। আর জাগ্রত অবস্থায় যে সকল বৃত্তি মানবানুভূতির মূল, স্বপ্নাবস্থায় তাহা হইতে পৃথক বৃত্তির অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। সুতরাং আত্মার স্ববৃত্তি সকল মহত্তর ভাবে, এবং অধিকতর উন্নত রূপে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া ব্যক্ত ইন্দ্রিয়গণের ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম হইবে, তাহা আর অসম্ভব হইতেছে না।

কিন্তু ঐ সকল স্বপ্নানুভূত ঘটনাবলী কি প্রকারের হইবে, সে পৃথক কথা। আমরা প্রথমে প্রেরক ও গ্রাহক, অর্থাৎ দর্শকের কথা উল্লেখ করিয়াছি। প্রেরক যে প্রকার বৃত্তান্ত কিম্বা সংবাদ প্রেরণ করিবেন, গ্রাহক স্বপ্নে তদ্রূপই *দেখিবেন, কিম্বা শুনিবেন,* অথবা গ্রাহকের জীবাত্মাই পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যেরূপ ঘটনাবলী অনুভব করিয়াছে, এক্ষণে স্বপ্নাবস্থায় তাহারও পুনরাবৃত্তি অনুষ্ঠিত হইতে পারে। মহর্ষি বলেন, জীবাত্মা কর্ম্মভোগ করেন। সুতরাং জীবাত্মার কর্ম্ম ফলে সাধু অথবা অসাধু কর্ম্ম সকল অভিনীত হইতে পারে। স্বপ্নাবস্থায় যখন জীবাত্মা দৈহিক বৃত্তি হইতে অনেকাংশে মুক্ত, তখন পূর্ব্বজন্মের ঘটনাবলীর পুনরাবৃত্তি করা, কিম্বা তাঁহার স্বভাবের অনুকূল নূতন নূতন ঘটনার অভিনয় করা অসম্ভব হইতেছে না। প্রেরকের উত্তেজনায় স্বপ্ন-দর্শক যে সকল স্বপ্ন দর্শন করেন, তাহা অবশ্যই সত্য হইবে; কারণ প্রেরক প্রকৃত অবস্থাই জ্ঞাপন করেন। আর যে সকল স্বপ্ন পূর্ব্বজন্মের ঘটনা সকলের আবৃত্তি মাত্র, কিম্বা আত্মার স্বভাব বশতঃ নূতন ভাবে

* Hindu System of self-culture By Kishori Lal Sarcar, M-A, B-L.

† Ency Brit. Dream.

উদ্ভাবিত, তাহা সত্য হইবার সম্ভাবনা নাই। অন্ততঃ তাহা এ জীবনের পরীক্ষিত সত্য হইবে না, অনুমান করা অসঙ্গত নহে?

শ্রীসরসীলাল সরকার।

ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ ও বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজ।

ঐতিহাসিকের নিকট ব্রাহ্মসমাজ অশীতিপর বৃদ্ধের স্থবিরত্ব অর্জ্জন করিলেও, এখনও ইহার প্রকৃত যৌবন সমাগম হয় নাই। বাল্যকালের চঞ্চলতা অতিক্রম করিয়া ব্রাহ্মসমাজ এখনও কৈশোরে পদার্পণ করে নাই। ব্রাহ্ম সমাজে যে সকল উচ্ছৃঙ্খলতা পরিদৃষ্ট হইতেছে, তাহাও বাল্যের বেয়াদবি ও হটকারিতা মাত্র, বিশ্বাসীর পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক ধারণা। এই ধারণার পক্ষে চিরপূজনীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের একটী উক্তি প্রমাণরূপে পরিগৃহীত হইতে পারে। তিনি বহু বার বহু ব্রাহ্মের সমক্ষে ব্রাহ্মসমাজকে এক ভাবী সুমহান বটবৃক্ষের ক্ষীণদেহ বীজের অঙ্কুরোদ্গম কাল বলিয়া বর্ত্তমান অবস্থাতে সন্তুষ্ট ও দৃঢ়-বিশ্বাস-নিবদ্ধ হইয়া পরমানন্দে ধর্ম্মসাধন করিয়া গিয়াছেন। এই মহাত্মার দীর্ঘজীবন-ব্যাপী ব্রহ্মসাধন, ব্রহ্মলাভাকাঙ্ক্ষী ব্রাহ্মমাত্রেরই পরম সম্পদ।

১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের শেষ ভাগে কয়েকজন বন্ধু লইয়া রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। এই হিসাবে ব্রাহ্মসমাজ আশীটী বৎসর অতিক্রম করিয়াছে। কিন্তু সমাজ-জীবনের পক্ষে আশী বৎসর কাল অতি অল্প সময়। এই অল্পকাল কোন ধর্ম্মসমাজের পরিণাম নির্দ্দেশকল্পে যথেষ্ট নহে। এখনই যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজকে অতীত ইতিহাসের পত্রায় বিশেষে স্থান প্রদানে ব্যস্ত, তাঁহারা অবশ্যই ভ্রান্ত। এই ভ্রান্তির দুটী কারণ সজীব মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাদের সম্মুখে নিত্য বিচরণ করিতেছে।

বেদোপনিষদের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত তেত্রিশকোটী দেবতার সৃষ্টি ও আবির্ভাব হইয়াছে, ইহার উপর ছয় শতাধিক বৎসরের মোস্‌লেম্ রাজত্বকালে অনেকগুলি পীর প্যাগম্বরও নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণের পূজার পাত্র হইয়াছেন। ইহার উপর আধুনিক শিক্ষিত জনজনের কৃপায় কয়েকটী নূতন অবতারের অবতারণাও হইয়াছে। এই সকলের সমবেত চেষ্টা, যত্ন ও প্রচারের ফলে ব্রাহ্মসমাজ লোকচক্ষে কেন্দ্রীভূত না হইয়া আবর্জ্জনার ন্যায় দূরে নিক্ষিপ্তপ্রায় অবস্থিতি করিতেছে।

ইহার উপর স্বদেশী-আন্দোলনের প্রবল জাতীয় বন্যামুখে সমগ্র জাতীয় জীবন,আপাততঃ ভালমন্দ-বিচার-পরিশূন্য হইয়া, কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞান-শূন্যের ন্যায় এক অনির্দ্দিষ্ট পথে ভয়ঙ্কর বেগে ধাবিত হইয়াছে। এ বেগের গতিরোধ চেষ্টা যেমন বর্ব্বরতা, ইহার গতি সুপথে পরিচালিত করাও ঠিক তেমনি কঠিন কাজ। আক্ষেপের বিষয় যে, সুপথে পরিচালন-যোগ্য ব্যক্তি এখনও এ জাতীয়-জীবন-সঞ্চারের সূতিকাগৃহে প্রসূত হয় নাই। প্রাচীনতম-তেত্রিশ কোটী দেবতার পূজা, পীর প্যাগম্বর প্রীতিবিধান, নূতন অবতারবাদের প্রস্তাব, তৎপরে সর্ব্বোপরি এই বর্ত্তমান জাতীয় জীবনের উন্মার্গগামী প্রবাহ ব্রাহ্মসমাজকে অতীত

ঘটনায় পরিণত করিতে চাহিতেছে। সাময়িক হিসাবে এটা একটী প্রবল সঞ্জীবশক্তি। দ্বিতীয়টী ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্নিবিষ্ট।

বাহিরের উপেক্ষা, অবজ্ঞা ও চাপিয়া মারিবার চেষ্টায় কোন শক্তি কখন বিনাশপ্রাপ্ত হয় না। শক্তি যাহা, তাহা অবিনাশী, বিনাশের অতীত শক্তিই ব্রহ্মশক্তি। ব্রাহ্মসমাজের শক্তি ব্রহ্মে সঞ্জীবিত পুরুষপ্রবর রামমোহন রায়ের হৃদয়-কন্দর হইতে অতি স্বাভাবিক ভাবে প্রবাহিত হইয়াছে। এই সহজ সত্যটুকু বুঝিতে হইলে, রাজাকে উত্তম রূপে বুঝিতে চেষ্টা করা আবশ্যক। আক্ষেপের বিষয়, আজ পর্য্যন্ত ব্রাহ্ম নামে পরিচিত অনেক ব্যক্তিই রাজার বিষয় অনভিজ্ঞ। রাজাকে না জানিলে, ব্রাহ্মসমাজের মধ্য দিয়া ব্রহ্মশক্তি কিরূপে স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছে, তাহা উত্তম রূপে বোধগম্য হইবে না। পিতৃপরিচয়ে অক্ষম ব্যক্তিকে আমরা যেমন ঘৃণা করিয়া থাকি, নিজ ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারিলে, অথবা ধর্ম্মান্তর গ্রহণের যথেষ্ট প্রমাণ ও কারণ প্রদর্শনে অক্ষম হইলে মানুষ ঠিক তদ্রূপ ঘৃণার পাত্র হইয়া থাকে। আরও আক্ষেপের বিষয় যে, ব্রাহ্মেরা এই কথাটা সর্ব্বদা স্মরণ রাখেন না।

বাহিরের লোকের ভ্রান্তিজাত অবজ্ঞা বাহিরের নানাপ্রকার আয়োজন ও আড়ম্বরের অন্তরালে লুকাইয়া উঁকি মারিতেছে, এতে ব্রাহ্মসমাজের কোন প্রকারে সাময়িক অনিষ্ট হইলেও, ইহার দ্বারা স্থায়ী অকল্যাণ হইতে পারে না। স্থায়ী অকল্যাণের নিদান-ভূমি—ব্রাহ্ম-সমাজের জন-সমষ্টির আভ্যন্তরীণ দুর্ব্বলতা। বর্ত্তমান সময়ে এই দুর্ব্বলতাই দারুণ ব্যাধিরূপে ব্রাহ্ম-সমাজকে রুগ্ন ও শক্তিহীন করিয়া ফেলিতেছে। ব্রাহ্ম-সমাজের হাতুড়ে চিকিৎসকগণ এই রোগের প্রতিকার-কল্পে নানা উপায় অবলম্বন করিতেছেন, কিন্তু নাড়ীজ্ঞান-বিহীন আনাড়ী কবিরাজের হাতে কেহ যেমন পিতা মাতা, আত্মীয় স্বজন ও স্ত্রী পুত্রের চিকিৎসার ভার রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না, এ স্থলেও রোগ নির্ণয় ও উত্তম ঔষধ প্রয়োগের জন্য অন্ততঃ ততটা ব্যস্ততা ও ব্যাকুলতা থাকা আবশ্যক, কিন্তু তাহা নাই। নাই যে, তাহাই পরে দেখাইতে চেষ্টা করিব।

ব্রাহ্মসমাজের যে আভ্যন্তরীণ দুর্ব্বলতার কথা বলিয়াছি, সে দুর্ব্বলতা যেমন তেমন দুর্ব্বলতা নহে। ধর্ম্মগত, ধাতুগত ও অবস্থাগত দুর্ব্বলতা। এই ত্রিবিধ দুর্ব্বলতা আবার জ্ঞানকৃত ও অজ্ঞানকৃত। ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বের একটী সামান্য ঘটনার কথা উল্লেখ করিতেছি। স্বর্গীয় শম্ভুনাথ পণ্ডিতের এক পুত্র শঙ্করনাথ, একদা আমাদের পূজনীয় শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট জন্মান্তরবাদ বিষয়ে কিঞ্চিৎ উপদেশ লইতে আসিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রচার-ভবনের বাহিরের ঘরে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, এমন সময়ে আমি আফিস হইতে আসিলাম। কথাবার্ত্তার গুরুত্ব ও গাঢ়তায় আমার ক্লান্ত হৃদয় মনকে আকৃষ্ট করিল, আমি গৃহ-প্রবেশ না করিয়া সেইখানেই তাঁহাদের কথা শুনিতে লাগিলাম। ভারতবর্ষীয় শাস্ত্র ও সংস্কার-কথিত জন্মান্তরবাদের অবশ্যই কোন প্রকার কিনারা হইল না সত্য, কিন্তু ভক্তিভাজন শাস্ত্রী মহাশয় একটী অতি মহামূল্য সত্য কথা সেই দিন সেই শুভ মুহূর্ত্তে বলিয়াছিলেন, জগতের সকল লোকের পক্ষে সেই সত্য কথাটী জানিবার ও সাধন করিবার বিষয়। তিনি বলিয়াছিলেন, "জন্মান্তরবাদ সত্য, কি আত্মার অনন্ত উন্নতিই

স্বাভাবিক, তাহা জানিবার জন্য ব্যস্ত হওয়া অপেক্ষা প্রাপ্ত জীবনের উপযুক্ত ব্যবহার দ্বারা জীবনের উন্নততর অবস্থায় অগ্রসর হইবার চেষ্টা করাই সঙ্গত। আমরা যাহা জানিতে পারিয়াছি, আমরা যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছি, তাহাই জীবনে সাধন করিতে পারিতেছি কই? যাহা ঠিক সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছি, তাহাই জীবনে ফলাইয়া তুলিতে পারিতেছি না, আর ছুটাছুটী করিয়া কি ফল?" এই কথা কয়টী ঈশ্বর-বিশ্বাসী সরল সাধু লোকের উক্তি, এবং ইহার মূল্য অনেক।

ইংরাজের পিনাল কোডের হিসাবে না হইলেও, বিধাতার পিনাল কোডে অজ্ঞতাজাত অপরাধের মার্জ্জনা আছে। তাই বলিয়া আনন্দে আটখানা হইয়া যাহারা অজ্ঞতারই পক্ষ সমর্থন করে, তাহারা মূর্খ, বলা বাহুল্য ঐ মূর্খতার মার্জ্জনা নাই। এই মূর্খতাই এক্ষণে দেহ ধারণ করিয়া বিরাট মূর্ত্তিতে ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে। কলিকাতার উপকণ্ঠে ভবানীপুর, সহরের সর্ব্ববিধ আড়ম্বরের মধ্যস্থলে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একটী ব্রাহ্ম যুবাপুরুষ ভবানীপুরে বাস করিতেন, তাঁহার নাম বিপিন চন্দ্র বর্ম্মণ। বয়স্ক ব্রাহ্ম মাত্রেই এখনও তাঁহার বিষয় বিস্মৃত হন নাই। তাঁহার সহিত আমারও বিশেষ পরিচয় ও আত্মীয়তা ছিল। একদা এক পৌষ মাসের প্রাতঃকালে তাঁহাকে নগ্নপদে দেখিয়া বলিলাম, "এ কি, এত শীতে শরীরের উপর এতটা অত্যাচার করা কি ভাল হইতেছে?" তিনি স্বাভাবিকই একটু গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। একটু হাসিয়া আমাকে বলিলেন, "জুতা কিনিবার পয়সা কই? কত লোক শীতে অনাবৃত দেহে অসীম ক্লেশ ভোগ করিতেছে, আমার জুতার পয়সায় তাদের গায়ের কাপড় হইতে পারে। কত লোক অনাহারে দিন যাপন করিতেছে, আমার জুতার পয়সায় তাহাদের দুই চারি দিনের আহারের সংস্থান হইতে পারে।" আমি নীরব। আমি বুঝিলাম, মানুষ মানুষের ভাই, আর ঈশ্বর সমগ্র জগতের পিতা, এ সত্যটা আমার নিকট ও আমার মত অসংখ্য ব্রাহ্মের নিকট মুখের কথা মাত্র, কিন্তু স্বর্গীয় অমর-আত্মা বিপিন চন্দ্র বর্ম্মণের নিকট এইটী সাধিত সত্য। "মানুষ মানুষের ভাই" একথাটা আমরা সকলেই কি স্বীকার করি না? স্বীকার মাত্র, স্বীকার করা ও সাধন করা দুটায় অনেক প্রভেদ, এটা কি আবার বুঝাইবার বিষয়? লোক কথায় বলে "অবুঝকে বুঝাব কত বুঝ নাহি মানে, ঢেকিকে বুঝাব কত নিত্য ধান ভানে।" এখানে অবুঝ কথাটার একটু তাৎপর্য্য গ্রহণ করা আবশ্যক। "অবুঝ" শব্দের অর্থ বুঝিতে অসমর্থ ব্যক্তি নহে, বুঝিতে যে চায় না, তাহাকেই "অবুঝ" বলে। আজ কালকার অবুঝের দল একটা সহজ কথাকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ঠিক তাহার বিপরীত অর্থে অথবা প্রয়োজন মত অবস্থাতে আনয়ন করিতে প্রয়াস পায়। এই শ্রেণীর লোকে আপাততঃ ভারতীয় ইংরাজ আদালতগুলি পরিপূর্ণ, ব্রাহ্মসমাজেও এই শ্রেণীর লোক সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। এই শ্রেণীর লোকেই কি রাজার ধর্ম্ম বিশ্বাস ও মহর্ষির ব্রহ্ম সাধনার উত্তরাধিকারী হইবার উপকরণ লইয়া সমাজ-গঠনে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন?

পূজ্যপাদ গোস্বামী মহাশয়, ব্রাহ্মসমাজের প্রচার কার্য্যে ব্রতী থাকা অবস্থায়, কোন এক স্থানে কথা প্রসঙ্গে, ভক্তিভাজন শাস্ত্রী মহাশয় সম্বন্ধীয় কোন কথাবার্ত্তায় একটু অসাবধান

হইয়াছিলেন। লোক, লোকের সম্বন্ধে সে রূপ ভাবের অসাবধান, নিত্য নিয়তই হইতেছে, কিন্তু আত্ম চিন্তার সময় কঠোরভাবে আত্ম-পরীক্ষা করিতে গিয়া গোস্বামী মহাশয় দেখিলেন যে, শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতি তাঁহার ব্যবহার ভাল হয় নাই, গোস্বামী মহাশয় এই ত্রুটি স্মরণ করিয়া সে রাত্রিতে নিদ্রাসুখে বঞ্চিত হইয়া অতিক্লেশে প্রাতঃকালের অপেক্ষায় সময়ক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অতি-প্রত্যুষে গোস্বামী মহাশয় আপনার বাসা হইতে বাহির হইয়া যখন সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের প্রচার-ভবনে আসিয়া শাস্ত্রী মহাশয়কে আহ্বান করিতেছেন, তখনও সমাজ-পল্লীর কেহই শয্যা ত্যাগ করেন নাই। অত প্রত্যুষে গোস্বামী মহাশয় আসিয়া শাস্ত্রী মহাশয়কে ডাকিতেছেন, আমি নিকটের গৃহে থাকিতাম, ত্বরায় উঠিয়া বাহিরে গিয়া দেখি, শাস্ত্রী মহাশয় উঠিয়াছেন, এবং গোস্বামী মহাশয় তাঁহার নিকট আপন ত্রুটি স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাহিতেছেন ও বলিতেছেন, "বলুন ক্ষমা করিলেন"। শাস্ত্রী মহাশয় কথাটা নিতান্ত অবহেলার জিনিষ মনে করিয়া গোস্বামী মহাশয়কে অনেক স্তুতি মিনতি ও সাধ্য সাধন করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, এতে কোন দোষ হয় নাই। গোঁসাই তাহা বুঝিবার পাত্র ছিলেন না। সুতরাং শেষে শাস্ত্রী মহাশয়কে স্পষ্ট বাক্যে "ক্ষমা করিলাম" বলিতে হইল। এইরূপ ব্যবহারেই কেবল মনুষ্য-সমাজ মনুষ্যপদবাচ্য হইতে পারে, এইরূপ আচরণেই কেবল মানুষ ইতর জীব হইতে আপনাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে সক্ষম, এইরূপ ব্যবহারের বাহুল্যেই কেবল মনুষ্য-সমাজ উচ্চ উপাদানের পরিচয় দিতে সক্ষম হয়। নতুবা কাকের মৃত্যুতে অসংখ্য কাকের মিলিত বেদনার পুরিচয় দানের ন্যায় কেবল মৃত ব্যক্তির দেহ পার্শ্বে দলবদ্ধ হইয়া, বা স্বজন রক্ষার জন্য মহীষের দলবদ্ধ হইয়া শত্রুনিপাতের চেষ্টার ন্যায়, কান অনুষ্ঠান দেখিলেই মানুষকে মনুষ্য-পদবাচ্য বলিয়া স্বীকার করিতে সম্মত নহি, কিন্তু হায় হায়, আজকাল, মৃত্যুতে ও অন্যবিধ বিপদেও আর ব্রাহ্মগণকে পূর্ব্বের ন্যায় দলবদ্ধ হইতে দেখা যায় না। দুঃখের বিষয়, ইতর জীবের উচ্চ লক্ষণ গুলিও মানুষ এই মর্ত্ত্য-সংগ্রামে হারাইয়া ফেলিতেছে। কিন্তু রাম মোহন রায় জমিদারীর পর্য্যবেক্ষণ ক্ষেত্রে রমাপ্রসাদের ব্যবহার-দোষ অবগত হইয়া কপালে করাঘাত করিয়া বলিয়াছিলেন, এদের প্রতি এত অত্যাচার। মোট নামাইয়া মুটে মোট তুলিতে অসমর্থ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, দশ জন পথিকের উপেক্ষা দেখিয়া, রাজা স্বয়ং অগ্রসর হইয়া তাহার মোট উঠাইয়া দিয়াছেন। সতীদাহে গঙ্গাতীরে বিচার পূর্ব্বক নিষেধ করিতে গিয়া ইতর ব্যবহারে পুরস্কৃত হইয়াও সতীদাহ-নিবন্ধন মর্ম্ম-বেদনা জ্ঞাপনে বিরত হন নাই, আবার ইতালীর স্বাধীনতার পতাকাকে সম্মান প্রদর্শন করিতে গিয়া চরণে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াও ক্লেশ বোধ করেন নাই, জীবনের অবশিষ্ট কাল প্রায় খঞ্জ হইয়াছিলেন। এইরূপ মহৎ হৃদয়েই ব্রাহ্মধর্ম্মের ও ব্রাহ্ম-সমাজের বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল।

এরূপ ভাবে আলোচনা করিতে গেলে, এ বিষয়ের পরিসমাপ্তির সম্ভাবনা বড় অল্প, তাই এরূপ পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া, কেবল কি কি বিষয়ের উন্নতির জন্য কিরূপ উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক, সেই দিকে ব্রাহ্ম-সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ব্রাহ্ম-সমাজের মজ্জাগত দুর্ব্বলতা তিন প্রকার :—ধর্ম্মগত, ধাতুগত, আর অবস্থাগত। এই তিনের শেষটীকে অগ্রে গ্রহণ করিতেছি। অবস্থাগত দুর্ব্বলতা কাহাকে বলে? ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের পৌষ মাসে কলিকাতায় জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন সময়ে, ভারতীয় একেশ্বরবাদিগণের যে সম্মিলন হইয়াছিল, সেই সম্মিলন-ক্ষেত্রে পূজনীয় শাস্ত্রী মহাশয় ব্রাহ্ম-সমাজের ধনী ও দরিদ্র, উভয়বিধ ব্রাহ্মের অবস্থাগত দুর্ব্বলতার আলোচনা অতি বিশদ ভাবে করিয়াছিলেন। সেই আলোচনার সময়ে তাঁহার মুখে বা লেখনীতে দৈবক্রমে একটী অতি খাঁটী সত্য কথা প্রকাশ পাইয়া গিয়াছে। বিভাগ কালে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মকে অবস্থাপন্ন, আর এক শ্রেণীর ব্রাহ্মকে তিনি নিম্নশ্রেণীর বলিয়া অভিহিত করিয়া অনেকের নিকট তিরস্কার লাভ করিয়াছেন। কিন্তু পাউণ্ড, শিলিং, পেন্স বা স্বর্ণ রৌপ্য যে লোকমণ্ডলীর মর্য্যাদা রক্ষার মেরুদণ্ডরূপে পরিণত হইয়াছে, তাঁহাদের তুলনায় অতর্কিত ভাবে শাস্ত্রী মহাশয় যদি এই "নিম্নশ্রেণী" শব্দটা ব্যবহার করিয়া থাকেন, তবে কি এমন গুরুতর অপরাধ করিয়াছেন, বুঝি না। আমাদের মনে হয়, তিনি উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মগণের মনের ধারণার অভিব্যক্তি করিয়াছেন মাত্র। এ বিষয়ে সমাজ সজীব হইলে, অথবা সমাজের একটা দৃঢ়তা থাকিলে, শাস্ত্রী মহাশয় অবশ্যই আপনার দোষ হইয়াছে বলিয়া অনুভব করিতে বাধ্য হইতেন, কিন্তু সমাজের অবস্থা ঠিক সেরূপ নহে। সমাজ বাস্তবিকই উচ্চ ও নিম্ন, দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। এবং উভয় শ্রেণীতে স্ব স্ব শ্রেণীর অবস্থাগত দুর্ব্বলতা দেখা গিয়াছে। এখন কি ইহার প্রতিকার সম্ভবপর? যে যে উপায় অবলম্বন করিলে এখন ইহার প্রতিকার হইতে পারে, ব্রাহ্মগণ কি সে বিষয়ে চিন্তা করিতে প্রস্তুত? আমাদের মনে হয়, না। বর্ত্তমান ব্রাহ্ম-সাধারণের পক্ষে সেরূপ নিষ্ক্রিয় ওজন আজ আর সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। আচ্ছা, বিধাতার বিধানে অনেক অসম্ভবও সম্ভব হইয়া থাকে, আমরা ইঙ্গিত করিয়া যাই, যদি ব্রাহ্মসমাজের সে সাধু প্রবৃত্তির উদয় হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনার পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া স্বীকার করিব এবং ধন্য হইব। যদি কোন বড় লোক কোন কারণে সম্মুখস্থ হন, বা আলাপ পরিচয়ে আপ্যায়িত হইতে আসেন, তাতে যদি নিজকে চরিতার্থ জ্ঞান কর, অথবা বর্দ্ধমানের মহারাজাকে পাইয়া দিশাহারা হও, তবে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে উচ্চ স্থান পাইবার উপযুক্ত ধর্ম্মার্থে ত্যাগ স্বীকারপরায়ণ সাধু দরিদ্র ব্যক্তিকে ততোধিক সম্মানের পাত্র কর। ব্রাহ্মসমাজের প্রবীণগণের মধ্যে অনেকেই অবগত আছেন, একটী সামান্য অবস্থার ব্রাহ্ম বন্ধুকে তাঁহার আত্মীয় স্বজন ব্রাহ্মধর্ম্ম ত্যাগ করাইবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিয়া ব্যর্থচেষ্ট হইয়া পরিশেষে তাহার মুখে বিষ্ঠা পর্য্যন্ত নিক্ষেপ করিয়াছে। তথাপি তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা ও ব্রহ্মে প্রীতির অভাব হয় নাই। কিন্তু তিনি চিরদিনই তোমার আমার সম্মুখে কাঙ্গালের ন্যায় বিচরণ করেন। রোগে চিকিৎসার অভাবে ছেলেগুলি এক এক করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, নিজেও দিন দিন জরাজীর্ণ হইয়া অবসন্ন-দশা-প্রাপ্ত, যদি নিষ্ক্রিয় ওজনে সম্মান প্রদর্শনে ব্যস্ত হইতে, যদি বিধাতার প্রিয়পাত্রগণের পরিচর্য্যা সমাজের অঙ্গরাগ বৃদ্ধি করিত, যদি মণি-মুক্তা-শোভিত স্বর্ণ রৌপ্যের পশ্চাতে উন্মত্তের

ন্যায় সমাজ আজ না দৌড়াইত, তাহা হইলে যিশু-কথিত ধনী অপেক্ষা আজ দরিদ্র বিশ্বাসী বিশ্বাস-মহাশয়ের সমাদর-সৌরভে সমাজ পূর্ণ হইত। ব্রাহ্মসমাজের বালক বালিকাগণও আজ ধর্ম্ম লাভের পথ, মোক্ষ লাভের পথ সহজ-সাধ্য বলিয়া অনুভব করিত। উপাসনা ও উপদেশে ব্রহ্ম লাভের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া, বাহিরে আসিতে না আসিতে, সমাজ-সমষ্টি যদি দেখে, উপদেষ্টারাই অর্থের দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে ও সমাজ-প্রধানগণ সেই শৃঙ্খল পরাইতে অগ্রসর, তাহা হইলে আর ভরসা কোথায়? ইংরাজ-সমাজের অনুকরণে আমরা সমাজগঠন করিতে গিয়া নিজেদেরও সঙ্গে-সঙ্গে আংশিক ভাবে সমগ্র হিন্দু-সমাজের প্রভূত অনিষ্ট সাধন করিয়া বসিয়াছি।

ইংলণ্ডে লর্ডএর ছেলে লর্ডই হইয়া থাকে, এ দেশেও ব্রাহ্মণের ছেলে ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে। গুণবিহীন হইলেও লর্ডের বড় ব্যাটা লর্ড হইবেই, এখানেও ব্রাহ্মণের ব্যাটা গুণহীন হইয়াও ব্রাহ্মণের সন্তান ব্রাহ্মণ, তবে প্রভেদ কোথায়? প্রথম প্রভেদ এই যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শ অনুসারে পাশ্চাত্য আভিজাত্যাভিমান ও প্রাচ্য আভিজাত্যাভিমান এক পদার্থ নহে ও একই গুণের বিদ্যমানতা প্রমাণ করে না সত্য, অধিকন্তু প্রাচ্যটী সম্পূর্ণরূপে চরিত্র ও আধ্যাত্মিক গুণগত, পাশ্চাত্যটী ঠিক্ তদ্রূপ ঐশ্বর্য্য ও সম্পদ, বীরত্ব ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির পুরস্কাররূপে প্রাপ্ত, সুতরাং দুয়ে প্রভেদ অনেক। অপর প্রভেদ এই যে, কোন অজ্ঞাতকুলশীল যত্ন, চেষ্টা ও অধ্যবসায় বলে পাশ্চাত্য আভিজাত্যাভিমান অর্জ্জন করিতে পারে, কিন্তু প্রাচ্য দেশে ব্রাহ্মণ-সন্তান যার তার ভাগ্যে ঘটে না। অতি প্রাচীন কালের ভারতীয় সামাজিক ইতিবৃত্তে ব্রাহ্মণেতর গুণবান ব্যক্তিবর্গকে ব্রাহ্মণ উপাধি ও ব্রাহ্মণ সম্মানে অলঙ্কৃত দেখিতে পাওয়া যায় সেরূপ ঘটনার বহুদৃষ্টান্ত বর্ত্তমান থাকিলেও, বহুদিন হইল, তাহা রহিত হইয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্য দেশে আভিজাত্যাভিমান অর্জ্জন করিয়া কাহাকেও কখন ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে হয় নাই, এদেশে কিন্তু পদে পদে গুণের অভাব হইলে, পতনের নির্দ্দেশ বর্ত্তমান রহিয়াছে। এদেশে ব্রাহ্মণের গুণগুলি রক্ষার জন্য যুগযুগান্তর ধরিয়া চেষ্টা হইয়া আসিয়াছে এবং স্বভাব ও আচার দোষে অনেককেই ইতর শ্রেণীর ও বর্ণের ব্রাহ্মণ হইতে হইয়াছে। কিন্তু তবুও তাহারা ব্রাহ্মণ। বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজ বিলাতী ছাঁচে গড়িতে গিয়া, এই ব্রাহ্মণের মাথায় মুদ্গর আঘাত করিয়া, ব্রাহ্মণ-আদর্শ ভাঙ্গিয়া চূর্ণবিচূর্ণ করিয়াছেন। এইরূপে চূর্ণবিচূর্ণ হওয়াতে আমাদের ব্যক্তিগত ভাবে একবিন্দু আপত্তি নাই, ভাঙ্গিয়া চুরমার কর, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে সামাজিক পবিত্রতা ও ক্রিয়াকলাপের বিশুদ্ধতা রক্ষার আদর্শ কোথায় কাহার চরণে বা মস্তকে চাপান হইল, ইহাই জানিবার বিষয়। স্বর্গীয় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ও আমাদের চিরপ্রিয় অগ্রজপ্রতিম স্বর্গীয় দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়, উভয়ই হিন্দু সমাজের চক্ষে, অর্থশালী ব্যক্তি না হইয়াও, সমাজ-শিরোমণি; ব্রাহ্মসমাজে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের দৌহিত্র ও গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র বা পৌত্রগণ কালে ব্রাহ্মসমাজের সম্পদের চাপে ইতরেতর হইবে কি না? যদি কেহ এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, কেন, চরিত্র ও ধর্ম্ম-বিশ্বাসের ওজনে তাঁহারা সম্মান-ভাজন হইবেন। তবে আমরা বলিব, বিশ্বাস মহাশয়ের ন্যায় বিশ্বাসী ব্যক্তিগণকে

ব্রাহ্মসমাজ যেরূপ ওজন করিয়া তাঁহার স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেইরূপ ত? হায়! হায়! হিন্দুগৃহের উচ্চবংশের উচ্চ সম্মান, ব্রাহ্মসমাজের এই অল্পকালব্যাপী স্থায়িত্বের ইংরাজী-টংএর মধ্যে যদি এরূপ ভাবে বিলুপ্ত হইবার ব্যবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকে, তবে অবস্থাগত দুর্ব্বলতা নিবন্ধন দরিদ্র ব্রাহ্মগণ যে ত্বরায় "নিম্ন শ্রেণীর" কেন, ইতর শ্রেণীর ব্রাহ্মে পরিণত হইবে, সে বিষয়ে কি কিছু সন্দেহ আছে? অচিরকাল মধ্যে এই "নিম্ন শ্রেণীর" ব্রাহ্মগণ মান্দ্রাজের প্যারিয়া সম্প্রদায়ে পরিণত হইবে। ব্রাহ্মগণের মধ্যে এক শ্রেণীর অবস্থাগত দুর্ব্বলতা তাহাদিগকে তাঁটার স্রোতে ভাসাইয়া কোন্ অনির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া চলিয়াছে, ব্রাহ্মসমাজের হৃদয়বান ব্যক্তিগণ কি একপ্রকার তাহা স্থির ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবেন? হিন্দু সমাজে যাহারা পুরুষানুক্রমে ভদ্রলোক থাকিত, ব্রাহ্মসমাজের গঠন-প্রণালী ও রীতিনীতি দোষে, তাহারাই ত্বরায় ইতর শ্রেণীতে পরিণত হইবে। ইহা সমাজগঠনের উৎকৃষ্ট পদ্ধতি বলিয়া মনে হয় না। আমাদের এ কথায় কেহ যেন এরূপ মনে করেন না যে, ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মণ-সন্তান বলিয়া একটা স্বতন্ত্র সম্মান স্বীকার করিয়া লওয়া হউক। যদিও আমরা জানি, ব্রাহ্মসমাজ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অন্যান্য জাতিই জাতি রক্ষার জন্য অধিক ব্যস্ত। কেন ব্যস্ত, তাহা পরে বক্তব্য।

তাহার পর ব্রাহ্মসমাজের অবস্থাপন্ন বা ধনীগণের অবস্থাগত দুর্ব্বলতার কথা বলিবার পূর্ব্বে একটী কথা বলা আবশ্যক। ধন সম্ভ্রমে সম্মানিত ব্যক্তি বলিয়া আমরা যাহা বুঝি, এই বিশাল বিস্তীর্ণ দেশে অসংখ্য কোটীপতি ও লক্ষপতির সংসার বর্ত্তমানে সে দেশের ব্রাহ্মসমাজে ধনী কেহ আছে বলিয়া মনে হয় না। ব্যাঙের আদুলিই অনেকের মূলধন, অর্থাৎ মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া যাঁহারা মাসে মাসে ৫।৬শ টাকা বা ৫।৬ হাজার টাকা উপার্জ্জন করেন, তাঁহারা বড় লোক বা ধনবান নহেন। যাঁহারা চক্ষু বুজাইলেই তাঁহাদের পরিবার ও পুত্রকন্যাগণকে গাড়ী ঘোড়া ও বাড়ী বিক্রয় করিতে হইবে, ভারতবর্ষেই হউক বা অন্য কোথাও হউক, তাঁহারা ধনী নহেন। এটাকে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের অবস্থা মাত্র বলিতে হয়। ব্রাহ্মসমাজে অবস্থাপন্ন বা ধনী বলিয়া যাঁহারা পরিচয় দিতে চান, অথবা ব্রাহ্মসমাজের লোকমণ্ডলী যাঁহাদিগকে ধনী বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা এই শ্রেণীর লোক। ইহাঁদের মধ্যে অনেকেই ফিরিঙ্গিয়ানাপটু ও সেজন্য সাধারণ-লোক-মণ্ডলী হইতে একটু দূরে দূরে অবস্থিতি করেন। ইহাঁদের অনেকেই, অথবা প্রায় সকলেই, পাণ্টকোটে ও হ্যাটে তুষ্ট, ধুতি, চাদর, চোগা-চাপকানে "লাইবেলের লেবেল" লাগান বলিয়া মনে করেন। এই শ্রেণীর লোকে এরূপ করিতে সাহস করিতেন না, যদি শাস্ত্রী মহাশয়-কথিত "নিম্নশ্রেণীর" ব্রাহ্মগণ এই বেশভূষার পক্ষপাতী ও সমাদরপরায়ণ না হইতেন। কিন্তু এ গুলিও বাজে কথা, প্রধান কথা এই যে, এই উচ্চ অবস্থার লোকদের ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষা, আত্মার পারত্রিক কল্যাণ-কামনা, ও ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য-সাধন আদর্শ কিরূপ প্রবল, তাহাই ভাবিবার বিষয়। অমুক, অমুক, অমুক আমাদের বন্ধু, সুতরাং তাঁদের সাতখুন মাপ, এরূপ ভাব সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ-প্রার্থীর লক্ষণ নহে। শারীরিক স্বাস্থ্য রিপুর ও মানসিক বৃত্তিগুলির সতেজ অবস্থিতির জন্য যেরূপ ব্যায়াম প্রয়োজন, প্রত্যেক মানুষেরই তাহা

অবশ্য কর্ত্তব্য এবং সে জন্য প্রয়োজনমত অর্থ-ব্যয় অনিবার্য্য। যে সমাজের অবস্থাপন্ন লোক এতদতিরিক্ত ব্যয় করিবার জন্য—সখ মিটাইবার জন্য ও সুখ-সম্ভোগের জন্য ব্যয় করিতে গিয়া সমাজের প্রচারক-মণ্ডলীকে, সমাজের আচার্য্য ও উপদেষ্টাগণকে অনসনে ও অর্দ্ধাসনে রাখেন, সে সমাজের পক্ষে তাহা যে দারুণ দুর্ব্বলতা, সে বিষয়ে কি সন্দেহ আছে? বিগত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে অনেকগুলি অবস্থাপন্ন ব্রাহ্মের লোকান্তর গমন ঘটিয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের জীবনের শেষমুহূর্ত্তে অর্জ্জিত অর্থের বণ্টন কালে দু একটী প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষ ভিন্ন আর কাহারও ব্রাহ্মসমাজকে স্মরণ হয় নাই। এই শ্রেণীর লোক ব্রাহ্মসমাজে যোগ না দিয়া অন্যত্র বিচরণ করিলে ব্রাহ্মসমাজ যে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইত, এরূপ মনে হয় না। এই গুলিই কি কেবল অবস্থাপন্ন ব্রাহ্মগণের অবস্থাগত দুর্ব্বলতা? না, ইহা অপেক্ষাও গুরুতর দুর্ব্বলতা বর্ত্তমান। সেইটীর সংশোধন-কল্পে ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক। যে সমাজের লোক-মণ্ডলী পূজ্যপাদ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের ন্যায় ত্যাগস্বীকার-পরায়ণ ব্যক্তির মাসিক গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য পঞ্চাশটী টাকার ব্যবস্থা করিতে কুণ্ঠা-বোধ করেন নাই, তাঁহাদেরই মহিলাকুল ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের আহূত মহিলা-সভায় স্থির করিয়াছিলেন. এক শত টাকা আয় দারিদ্র্যের লক্ষণ। ঐ পরিমাণ আয়ে পারিবারিক জীবন-যাত্রা-নির্ব্বাহ করা এক সুকঠিন ব্যাপার। তাহা না হইলে, একশত টাকা আয়ের সংসারে ৪।৫টী সন্তানের ভরণ-পোষণ ও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়া মাস মাস কি করিয়া পাঁচ টাকা সঞ্চিত রাখা যায়, এ বিষয়ে যে মহিলা উত্তম প্রবন্ধ রচনা করিতে পারিবেন, তিনি মহিলা-সমাজ হইতে পুরস্কার পাইবেন, এরূপ বিজ্ঞাপন প্রচারে সাহস হইত না। ইহাঁরাই বলিয়া থাকেন, দুই শত টাকা মাসিক আয় না হইলে ভদ্রলোক হওয়া যায় না। সুতরাং সাংসারিক ধর্ম্মজীবন যাপন জন্য অর্থ যে অনর্থ আনয়ন করিল, ব্রাহ্মসমাজ কি কোন দিন ইহার হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিবে? অবশ্য প্রত্যেক ব্যক্তির ইষ্টানিষ্টের জন্য সেই সেই ব্যক্তিই বিধাতার নিকট দায়ী, কিন্তু সমাজ-গঠন করিতে গেলে, সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই যে সমাজ-সমষ্টির নিকটও দায়ী, একথাটা কেন যে সমাজের লোকমণ্ডলী, বিশেষভাবে সমাজ-প্রধানেরা উত্তমরূপে শিক্ষা করিলেন না ও শিক্ষা দিলেন না, ইহাই খুব আশ্চর্য্যের বিষয়। জগতের লোক-মণ্ডলীকে জয় করিয়া আপন দলভুক্ত করিতে হইলে যে প্রবল মানসিক শক্তি, যে বিদ্যাবত্তা, যে অনুসন্ধান ও জ্ঞানের প্রয়োজন, সর্ব্বোপরি যে ধর্ম্মবিশ্বাস ও সেই বিশ্বাসানুরূপ অনুষ্ঠানের প্রয়োজন, তাহা দূরের কথা, যে সমবেতচেষ্টা ভিন্ন কোন লোকসমষ্টি উত্তমরূপে গড়িয়া উঠিতে পারে না, ব্রাহ্মসমাজে সেইরূপ সমবেত চেষ্টার এখনও সূত্রপাতই হয় নাই।

বিষয় কর্ম্মে লিপ্ত ব্রাহ্মগণ আপন আপন আর্থিক অবস্থার উন্নতিসাধন করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করেন, ইহা সুখের বিষয় ও গৌরবের কথা, সন্দেহ নাই, কিন্তু সমাজের আচার্য্য, উপদেষ্টা ও প্রচারকগণ, বিষয়ী লোকের ভোগ বিলাসের অন্তরালে দরিদ্রের ন্যায় দিন যাপন করিলে, কিম্বা অবস্থাবৈগুণ্য-নিবন্ধন, সমাজের ব্যক্তিবিশেষের অনুগ্রহ-ভাজন হইতে বাধ্য হইলে, সে সমাজের কল্যাণ সুদূরপরাহত। ব্রাহ্মসমাজের লোকমণ্ডলী বলিতে পারেন যে, সকল লোকের সাংসারিক জীবনযাপনের

আদর্শ একরূপ নহে এবং এক প্রকার হইবার মত উপার্জ্জনও সকলে করে না। সমাজে সকল অবস্থার লোকই থাকিবে, ইহা নিশ্চয় কথা, কিন্তু সমাজের শীর্ষস্থানীয় আচার্য্যগণ কি বিষয়কর্ম্মের প্রলোভন ত্যাগ করিয়া হৃদয়গ্রন্থি ও মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ-সাধন ব্রত গ্রহণ করার অপরাধে সামান্য অর্থে সংসার-যাত্রা-নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য? আচার্য্য ও প্রচারকগণকে শীর্ষস্থানীয় হইবার অযোগ্য মনে করিলে, সেরূপ অযোগ্য লোককে প্রচারক ও আচার্য্যপদে নিযুক্ত না করিলেই চলিতে পারে। অযোগ্য লোককে উপদেষ্টার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া ২০।২৫ টাকায় কাজ-চালান, আর কতকগুলি তাঁবেদার তৈয়ার করা একই কথা। হিন্দুসমাজের পূজনীয় স্বনামধন্য ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতমণ্ডলী যখন স্ববশে ছিলেন, তখন তাঁহাদের প্রদত্ত-বিধি-নিষেধ সমাজের সজীবতা সম্পাদন করিত। ব্রাহ্মণগণ যখন হইতে অন্যান্য বিষয়ী লোকের তাঁবেদার হইয়াছেন, তখন হইতেই সমাজের সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় আচার্য্যগণ যখন হইতে রাজনৈতিক ইঙ্গিতের অনুবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তখন হইতে খ্রীষ্টীয় জগতের অধঃপতনের সূত্রপাত হইয়াছে। ভারতে প্রাতঃস্মরণীয় কেরী, মার্সম্যান, ও ডফ্ সাহেবকে এদেশীয় ইংরাজ-গভর্ণমেণ্ট ভয় ও ভক্তি করিতেন। তাই তাঁহারা মুখ ফুটিয়া অনেক সময়ে রাজশক্তির বিরুদ্ধে আপন আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে সাহস করিতেন। এখন এদেশে আর সে চরিত্রের মহানুভব খ্রীষ্টান-আচার্য্যগণের বিচরণ দৃষ্টিগোচর হয় না, এদেশে ইংরাজের রাজশক্তি ও ধর্ম্মভাব দুই পৃথক পথে চলিয়াছে, ব্রাহ্মসমাজ এই স্বদেশীয় ও বিদেশীয় সর্ব্ববিধ বৈষম্যের মধ্যস্থানে সাম্য আনয়নের বিজ্ঞাপন ললাটে ধারণ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছিলেন। আক্ষেপের কথা, লজ্জার কথা, ক্ষোভের কথা এই যে, যে সর্ষপে ভূত ছাড়াইবে, সেই সর্ষপেই ভূত প্রবেশ করিয়াছে। হায়! অর্থের কি অসীম মহিমা, অর্থ ব্রাহ্মসমাজকে স্পর্শ করিতে না করিতে ইহাকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিল। ব্রাহ্মসমাজের জনৈক শ্রদ্ধেয় প্রাচীন প্রচারক মহাশয়কে আমি সময় সময় কর্ম্মোপলক্ষে উপস্থিত হইয়া এরূপ জনসঙ্গ করিতে দেখিয়াছি, যাহা আমাদের নিকট লজ্জাজনক বলিয়া মনে হইয়াছে। তাঁহার আচরণ দেখিয়া মনে হয় না যে, ইনি স্বর্গীয় অমরাত্মা কেশবচন্দ্রের সঙ্গসুখে এক সময় সম্মানিত হইয়াছিলেন। হায়, অর্থের কি মোহিনী শক্তি!

অবস্থাগত দুর্ব্বলতা বিষয়ে আরও অনেক কথা বলিবার থাকিলেও, আমরা আপাততঃ একটী প্রবন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উহার আলোচনা না করিয়া, কেবল আর একটী মাত্র বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। সমগ্র ভারতবর্ষে, বিশেষ ভাবে বাঙ্গালা দেশে কতকগুলি 'মধ্যবিত্ত অবস্থার ভদ্র সন্তান ধর্ম্ম বিশ্বাস নিবন্ধন ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছেন। ইঁহাদিগকে লইয়াই ব্রাহ্মসমাজ। এখনও নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ভাব প্রচারিত ও তাহাদের কর্ত্তৃক এ ধর্ম্ম পরিগৃহীত হয় নাই। যখন সমাজ মধ্যে সেরূপ অবস্থা আসিবার সময় উপস্থিত হইবে, তখন অবস্থাপন্ন মধ্যবিত্ত ও নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মের পরিবার লইয়া যে মহা সংগ্রাম উপস্থিত হইবে, সে অবস্থায় সামঞ্জস্য রক্ষার উপযুক্ত উপকরণ সমাজ মধ্যে বর্ত্তমান আছে কিনা? ইহাই এক্ষণে ভাবিবার এবং

ইহার প্রতিবিধানের উপায় নির্দ্দেশ করা এবং সেইরূপ ভাবে চলা আবশ্যক। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজ, ইংরাজ সমাজের ছাঁচে ঢালিলে চলিবে না, দেশীয় রীতি নীতি ও পদ্ধতির অনুরূপ করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে।

অর্থ সম্পদ কোন দিনই এ দেশীয় ধর্ম্ম-সমাজ-গঠনের উপকরণরূপে পরিগৃহীত হয় নাই। শত শত প্রাচীন দৃষ্টান্তের উল্লেখ অনাবশ্যক। বর্ত্তমান সময়ের এক সাধু পুরুষের জীবন যাপন হইতে দুটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। গোস্বামী মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক পদ পরিত্যাগ করার পর যখন তিনি স্বর্গীয় রাখাল রায় মহাশয়ের সুকিয়াষ্ট্রীটের বাটীতে অবস্থিতি করিতেন, তখন রাখাল বাবু দুই একজন লোককে গোঁসাইয়ের মণ্ডলীভুক্ত করিবার জন্য অনুরোধ করেন। গোঁসাই সে লোকের ভাবভঙ্গি দেখিয়া অসম্মতি প্রকাশ করেন। রাখাল বাবু পুনরায় অনুরোধ করিবামাত্র গোঁসাই স্পষ্ট ভাষায় তাঁহার মুখের উপর বলিয়া দিলেন "কেন? আপনার এখানে আছি বলিয়া?" রাখাল বাবু নীরব হইলেন। অপর ঘটনা ভবানীপুরবাসী স্বর্গীয় উমাচরণ দাস মহাশয়, গোস্বামী মহাশয়ের মণ্ডলীভুক্ত হওয়ার পর, গুরুর বৃন্দাবনে অবস্থিতি কালে, একদা তিন মাসের বিদায় লইয়া গুরুর নিকট বৃন্দাবন বাস করিতে গিয়াছিলেন। ২।৪ দিন অপেক্ষার পরই গোঁসাই উমাচরণ বাবুকে বাড়ী ফিরিতে বলিলেন। উমাচরণ বাবুর ইচ্ছা কিছু দিন বৃন্দাবনে গুরুর নিকট থাকিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করেন। গোঁসাই বলিলেন, তাহা কিছুতেই হইবে না। শেষে অনেক সাধ্য সাধনার পরও গোঁসাই বলিলেন "আপনি বৃন্দাবন ত্যাগ না করিলে আমি বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইব।" এ সব ঝোঁকের কাজ নহে। ঈশ্বরপরায়ণ চক্ষুষ্মান ব্যক্তির তীব্র দৃষ্টির নিকট আদর্শের ব্যতিক্রম কোন দিন অনুমোদনীয় নহে।

যে কোন অবস্থাতেই মানুষ অবস্থিত হউক না কেন, অবস্থার অনুরোধে ধর্ম্ম সাধনে বিঘ্ন হইতে পারে না। তাই যে সত্যটুকু আমরা জানিয়াছি, সকল অবস্থাতেই তাহা সাধন ও পালন করিতে বাধ্য। (২) সকল অবস্থাতেই অন্যের সম্বন্ধে সংযতবাক্ ও আত্ম-পরীক্ষার তীব্র দৃষ্টি আত্মার কল্যাণের জন্য অনিবার্য্য। (৩) "কেতা-দুরস্ত" সভ্যতা-সঙ্গত সহানুভূতি একপ্রকার ভণ্ডামি, ইহার হাত হইতে উদ্ধার লাভ আবশ্যক ও অন্যের সর্ব্ববিধ বিপদে মর্ম্মস্পর্শী সহানুভূতি ধর্ম্মের নামান্তর মাত্র, ইহা সাধন করিতে হয়। (৪) সকল অবস্থাতেই মানুষের জ্ঞান-চর্চ্চার সুযোগ প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান, প্রত্যেক ব্যক্তিরই সে বিষয় অনুরাগী হওয়া আবশ্যক। (৫) কাহারও সম্বন্ধে কোন শ্রুত কথা বেদবাক্য রূপে গ্রহণ করার পূর্ব্বে সে বিষয় ঠিক খাঁটি কথা জানিবার জন্য সেই ব্যক্তির নিকট সর্ব্বাগ্রে শ্রবণ করাই ধর্ম্ম, না করিলে সাধারণ ন্যায়-বিচারে লোককে বঞ্চিত করার অপরাধে অপরাধী হইতে হয় এবং তাহা গুরুতর অপরাধ। অবস্থার দাসত্ব করিতে গিয়া ব্রাহ্মগণ অপর দশজনের ন্যায় আদর্শহীন হইয়া পড়িতেছেন। ধর্ম্মগত ও ধাতুগত দুর্ব্বলতার আলোচনা বারান্তরে করিব।

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৈশাখী।

ফাল্গুন গেল, চৈতালিও বিদায় হ'ল শেষে,
বসন্তের রেশ টুকুনি বেলায় বেড়ায় হেসে,
মল্লিকা যুঁই হেসেই আকুল ব্যাকুল পাগল প্রাণ,
বউ-কথা-কও পাগল পাখী ছড়ায় প্রেমের তান।
তপ্ত সাঁজের বাতের মাঝে ছুটছে মধুরতা,
কোন কাননে উঠ্‌ছে দুলে গোঁসাই কবির লতা,
নীল সাগরে উঠ্‌ছে ভেসে, লক্ষ মণির দেরা,
মন-ভুলান একটা মাণিক সুধার সাজে ঘেরা।
তমাল বনের কাল রেখা উঠ্‌ছে উজল হ'য়ে,
কত ছায়া মূর্চ্ছা গেল জ্যোস্না বুকে ল'য়ে।
কালকুটে ওই বিহগ কবি আকাশটারে ফুঁড়ে,
তান পাঠাচ্ছে কিসের লাগি চাঁদের দেশে দূরে?
এমন কাব্যে প্রাণ গলে না কাব্য পড়ি কবিদের।
তারি কাব্য গণ্য করি ভণ্ডামিতে যিনি সের।
কাব্যে যাহার artificeটা কেবল মাত্র গজগজায়,
তারি কাব্য বর্ত্তমানে পাঠকবৃন্দের প্রাণ মজায়।
জবরদস্তি লিখ্‌ছেরে ভাই—শালুক মাঝে গোবরা,
সাঁচের সঙ্গে নাহিক খেজি আগা গোড়াই ছোবরা।
Prunning করা কাব্য তাহার prunning
করা চলিত ভাষা,
চাঁদের কিরণ পানের মত মেটে নাক একটু আশা,
সজল চোকে দয়ারাণী কবিশাস্তে দাঁড়িয়ে থাকে।
বিনয়-ঘেরা বশের দম্ভ কবিটারে জীয়িয়ে রাখে।
কাব্য বটে তুলার বস্তা কবি বড়ই শক্ত,
না বুঝিয়ে হায়রে কপাল আমিও ছিলাম ভক্ত।

এখনও মোহিতা, সুধার লাগিয়ে
নিদ ভুলে থাকে জাগি,
এখনও লালসা বিবসা অবশা
উদাসিনী তার লাগি।

পাকা ভাষা তোমার যেমন আমারও তেমন ভাই,
তুমি জান lop off কত্তে, সে বিদ্যা মোর নাই,
Rugged beauty ভাষা হ'তে ক্রমেই যাচ্ছে চলি,
তোমার দানটা স্বর্ণ-ভিক্ষা এই কথাটাই বলি।
ভাবক বলে মিলাও তুমি মন্দার সনে রাকা,
Absurdity বুঝলাম নাক হ'য়ে রলের ভাকা।

প্রাচীন বঁধু ফুলের কবি Boy-কবিদের চাঁই,
ভাবক হ'য়ে লিখ্‌লো শেষে এমনি দেখি নাই।
এমন দেখি নাইরে কভু, এমন দেখি নাই,
দিনের গায়ে চাঁদের আলো কে দেখেছে ভাই।
গার্ডেন পরা কবিতাতে মজে গেল দেশটা,
প্রেমটা হ'ল আর কিছু নয় চুমার ব্যাপার শেষটা।
মন চলেছে অধর তীর্থে চয়ন কত্তে সে কথা,
বেহামিটা ভেবে শুধু মন মাঝারে পাই ব্যথা।
প্রবাসী ও ভারতীতে Genius কল্লে মাটি,
পরক কত্তে ফুটন্ত ডা'লে দিয়ে বসেলো কাটি।
(সেদিন) সোণার বীণা হাতে দিয়ে কাঠের বীণা
কেড়ে নিল,
সব ফুরাল, আশা ভর্ষা, বাঙ্গালা ভাষার যারা
ছিল।
"জীবন-স্মৃতির" মাঝে শুধু আমিত্বের তিমি জাগে,
যুমিয়াদির তীব্র-গন্ধ, নাসারন্ধ্রে কেমন লাগে,
ঠাস বুনুনি ভাবের মাঝে, লুকিয়ে জ্বলে প্রেমের
শিখা,
দরকার হ'লে আমিই কর্ব্বো, এক সময়ে তাহার
টীকা।
ফাঁদ-পাতা ওই মন্দা witch প্রয়াগ মন্ত্রে সিদ্ধি
লভি,
রাখ্‌লো ধরে সোণার খাঁচায় যারে বলে অনল কবি
গরম মসলা মাখা একটু দলাদলির মিহি গন্ধ,
কোথা থেকে আন্‌ছ টেনে কেমন একটা পাতলা
সন্ধ;
কবি নামটা ফিরবে নাক, "যতী" নামটা জাহির
কর,
কঠোম খানি আস্ত গিলে দেখ বিশ্বচরাচর।
স্পষ্ট বল্লে কষ্ট হবে তাই কল্লেম কাছু। ও
নাপিত যেমন বয়কে বলে ভ্যা করতো বাপু।
(আমার) শুধু বার্ধিকটা রাখা শুধু বার্ধিকটা রাখা,
কথা দিয়ে মন-মানুষের ছবি টুকু আঁকা।

শ্রীবেণীমাধবলাল গোস্বামী।

মাদাম ব্লাভাস্কীর জীবন-কথা।

বাল্যজীবন।

মাদাম জেলিহোবাস্কীর কথিত বিবরণ হইতে যে সকল কথা উদ্ধৃত হইল, তাহাতে ব্লাভাস্কীর বাল্য-চরিত্রের কতক আভাষ পাইলাম। ইহা ছাড়া আরও অনেক ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে, কিন্তু নিষ্প্রয়োজন।

মাদাম ব্লাভাস্কীর বাল্যজীবনের অসাধারণ কার্য্যাবলীতে দুইটী তত্ত্ব সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। প্রথমটী এই যে, তিনি কতকগুলি অদ্ভুত সংস্কার লইয়া জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দু-পাঠককে বুঝান অনাবশ্যক যে, মানুষ জন্মান্তরে যে সকল কর্ম্ম করে, পরজন্মে সেই সকল কর্ম্মসংস্কারই তাহার প্রবৃত্তিরূপে প্রকাশ পাইয়া আত্মপরিচয় প্রদান করে। সংস্কার কি? আমরা চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা যে সকল বিষয় অনুভব করি, অথবা হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা যে সকল স্থূল কর্ম্ম করি, কিম্বা উভয়াত্মক মন দ্বারা যাহা যাহা ভাবনা করি—সেই সকল বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক কর্ম্মের যে চিহ্ন (Impression) আমাদের অন্তরে থাকিয়া যায়, তাহাকেই সংস্কার বলে। সংস্কার সকল সূক্ষ্ম শরীরে আহৃত থাকে। এই সূক্ষ্ম শরীরেরই পুনঃপুনঃ জন্ম হয়, সুতরাং পূর্ব্বসংস্কার লইয়া জীবের পুনঃপুনঃ জন্ম হইতেছে। দর্শনকার মহর্ষি সংস্কার ব্যাখ্যা কালে উহাকে স্মৃতির সহিত তুলনা করিয়াছেন, যথা—"জাতিদেশকালব্যবহিতানামপ্যানন্তর্য্যং স্মৃতি-সংস্কারয়োরেকরূপত্বাৎ" (পাতঞ্জল দর্শন—৪র্থ পাদ—৯ম সূত্র)। অনুভূত বিষয়ের অসম্প্রমোষই স্মৃতি—অর্থাৎ আমরা এক সময়ে ইন্দ্রিয়ের সহিত ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়ের সংস্পর্শ-জনিত যে সুখ বা দুঃখ অনুভব করি, সময়ান্তরেও সেই অনুভূতির বিলোপ না হওয়াকে স্মৃতি বলে। ইহজীবনে অনুভূত বিষয় যে সময়ে মনে জাগিয়া উঠে, তাহাকেই স্মৃতি বলা গিয়া থাকে। আর পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের অনুভূত বিষয় বা কৃতকর্ম্মের যে চিহ্ন লিঙ্গশরীরে সংলগ্ন থাকে এবং ইহজীবনে এক অদৃশ্য-শক্তিবলে মানুষকে শুভাশুভ কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে, তাহাকে 'সংস্কার' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে,—তাহাকেই অদৃষ্ট বা কর্ম্মলিপি বলা গিয়া থাকে। সংস্কারই স্মৃতিরূপে জাগিয়া উঠে,—পরন্তু স্মৃতিই সংস্কারকে প্রমাণ করিয়া দেয়। শুভকর্ম্মের সংস্কার শুভ, অশুভ কর্ম্মের সংস্কার অশুভ, এবং শুভাশুভকর্ম্মের সংস্কারও মিশ্রিত। এইরূপে ভালমন্দ কর্ম্মদ্বারাই আমরা নিজ নিজ ভালমন্দ অদৃষ্টের সৃজন করিতেছি। এই প্রবৃত্তিরূপী সংস্কার রাশি দ্বারাই আমরা মানবের প্রাক্তন-কর্ম্মের পরিচয় পাইয়া থাকি। পূর্ব্বজন্মে কে কিরূপ কর্ম্মের অভ্যাস করিয়া আসিয়াছে, তাহার ইহজীবনের প্রবৃত্তিই উহা অঙ্গুলিনির্দ্দেশ পূর্ব্বক দেখাইয়া দিতেছে। এক্ষণে আমরা বুঝিতে পারিব, মাদাম ব্লাভাস্কীর সহজাত এই সকল অদ্ভুত-প্রবৃত্তির মূল কোথায়। এ তত্ত্ব অতীব জটিল এবং নানা সংশয়পূর্ণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ইহার নির্ণয়ে অদ্যাপি হতবুদ্ধি। একমাত্র ঋষি-প্রণীত অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের অনুসরণ করিয়া চলিলেই জগতে

এই বৈষম্য, এই সুখ-দুঃখের তারতম্য, এই জ্ঞান-বুদ্ধির উচ্চাবচ অবস্থা রূপ গভীর জটিলতার মধ্যেও একটা সুন্দর পথ, একটা প্রণালী, একটা অনাদি কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলার অস্তিত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতি শৈশবকাল হইতেই ব্রাভাস্কীর এই জ্ঞান-গুরুর আচরণ, সাধারণ বালক বালিকা হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ এক অপূর্ব্ব প্রকৃতি, ভূত-ভবিষ্যতের অন্ধকার-ভেদকারী যোগীজনোচিত সূক্ষ্ম-দৃষ্টি-শক্তির যে আভাষ পাইলাম—ইহা কোথা হইতে আসিল? ইহা তাহার জন্মান্তরীণ অদ্ভুত সাধন, অদ্ভুত কর্ম্মের ফল, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই,—ইহাই আর্য্য যুক্তি। জন্মান্তরীণ অপূর্ব্ব সাধনাবলেই তিনি শৈশবেই—যখন পৃথিবীর বালক-বালিকামাত্রেই খেলাধূলায় উন্মত্ত—প্রকৃতির অন্তর্নিহিত গুপ্ততত্ত্ব আয়ত্ত করিতে অগ্রসর। জন্মান্তরীণ সংস্কাররাশি দ্বারা পরিচালিত হইয়াই তাঁহার সমুদায় চিত্তবৃত্তি তদনুযায়ী কর্ম্মে প্রযুক্ত। ইহা যেমন তাঁহার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মের গতি দেখাইয়া দিতেছে, তেমনি তাঁহার ভবিষ্যতের জীবন-পথও নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে। আমরা মানবের জীবন যতই পর্য্যালোচনা করিব, ততই ইহার পরিচয় পাইব। এইরূপ প্রধান সংস্কার-সম্পন্ন জীবন স্বীয় প্রবৃত্তি পথে চলিতেই সদা তৎপর, গৈরিক-স্রোতের ন্যায় স্বাভাবিক গতিবলে আপনার পথ আপনিই ফাটিয়া বাহির হইয়া যায়,—উহার বিরুদ্ধে কোন বাধা, কাহারও কথা মানিয়া চলিতে পারে না, পৃথিবীর কাহারও আদেশ উপদেশের অপেক্ষা রাখে না। তাই আমরা কুমারী হ্যানকে সময়ে সময়ে স্বকার্য্যে বাধা পাইলে বড়ই উন্মার্গগামী ও উচ্ছৃঙ্খল দেখিতে পাইয়াছি।

প্রেততাত্ত্বিকগণ (spiritualists) যাহাকে মিডিয়মিক অবস্থা (mediumistic state) বলেন, ব্রাভাস্কীর শৈশবেই উহার সকল চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। প্রেতাহ্বান-চক্র প্রভৃতি ব্যাপারে যে ব্যক্তি আবিষ্ট হয়—অর্থাৎ যাহার সংজ্ঞাশূন্য-দেহকে আশ্রয় করিয়া কোন প্রেত বা অপর কোন সূক্ষ্মশরীরী প্রাণী জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তরদান বা আপন বক্তব্য প্রকাশ করে,—তাহাকে 'মিডিয়ম' বলা গিয়া থাকে। কুমারী হ্যানের যে নিকট আত্মীয়ার কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তিনি বলেন যে, চার বৎসর বয়স হইতেই "বালিকা স্বপ্নাবস্থায় চলিয়া বেড়াইতেন ও উচ্চকণ্ঠে কথা কহিতেন। বালিকা গভীর নিদ্রামগ্ন, অথচ অদৃষ্ট-ব্যক্তিগণের সহিত তাহার সুদীর্ঘ কথাবার্ত্তা চলিতেছে;—যাহারা শিশুর শয্যার চতুষ্পার্শ্বে বসিয়া থাকিত, তাহার এই সব কথাবার্ত্তা শুনিয়া কখনও আমোদিত, কখনও শিক্ষাপ্রাপ্ত, কখনও বা ভীত-চকিত হইত। অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে যে তিনি ঘুমাইয়া আছেন, অথচ কোন লোক তাঁহার হস্তস্পর্শ করিয়া অপহৃত বা নষ্ট দ্রব্য, অথবা সাময়িক কোন উদ্বেগজনক বিষয়ে প্রশ্ন করিবা মাত্র তিনি তাহার উত্তর দিতেন, যেন বালিকা প্রাচীন যুগের কোন দৈবজ্ঞ। বহুবর্ষ পর্য্যন্ত এরূপ দেখিয়াছি, হেলেন যেন শৈশব-সুলভ চপলতা বশেই গৃহাগত কোন পরিচিত বা অপরিচিত ব্যক্তির মুখপানে সাগ্রহ দৃষ্টিতে তাকাইতে তাকাইতে বলিয়া ফেলিতেন যে, অমুক তারিখে উহার মৃত্যু হইবে, কি অমুক দিনে উহার উপর কোন বিপৎ সম্পাৎ হইবে। এই সকল বিষয়ে বালিকার ভবিষ্যদ্বাণী প্রায়ই সত্য হইত বলিয়া গৃহমধ্যে তিনি একটা ভয়ের বস্তু হইয়া দাঁড়াইলেন।" যাহা হউক, তাঁহার আধ্যা-

স্বিক জ্ঞান বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত মিডিয়-মোচিত আবিষ্ট অবস্থার সীমা তিনি অতিক্রম করিয়া যান, এবং স্বীয় সজ্ঞান সচেতন শক্তি বলে অনেক বিস্ময়কর কার্য্য সম্পন্ন করেন। এ সকলই তাঁহার পূর্ব্বলব্ধ সাধনশক্তিকে সূচিত করিতেছে।

দ্বিতীয় তত্ত্বটী আরও রহস্য-জড়িত, প্রহেলিকাময়। আমরা দেখিয়াছি, শৈশবেই কুমারী হ্যান মহাপুরুষগণে আস্থাবান। কুমারী হ্যানের মহাপুরুষগণ পুরাণেতিহাসে বর্ণিত কোন যক্ষঃ রক্ষঃ গন্ধর্ব্ব বা দেবতা নহেন যে, ঐ সকল গ্রন্থ পড়িয়া তাঁহাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তখনও তাঁহার মহাপুরুষ সম্বন্ধে প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার বা বুঝিবার ক্ষমতা হয় নাই। অথচ তিনি ঐ শ্রেণীর মহোন্নত জীবের অস্তিত্বে বিশ্বাসী, শুধু বিশ্বাসী নহে, তাঁহাদের দিকে অত্যন্ত আকৃষ্ট। ইহার কারণ কি? তাঁহার জীবনের উপর বাল্যাবধি একজন অদৃশ্য শাসনকর্ত্তা সততই বর্ত্তমান দেখিতে পাই। কুমারী হ্যান সর্ব্বদাই অদৃশ্য প্রাণীগণে বেষ্টিত থাকিয়া তাহাদের সহিত কথোপকথন ও ক্রীড়া কৌতুক করিতেন। কিন্তু সময়ে সময়ে এমন একজন মহাপুরুষ তাঁহার নয়ন সমক্ষে আবির্ভূত হইতেন—যাঁহার আদেশ এবং শাসন অতিক্রম করা তাঁহার সাধ্যাতীত। তিনি শৈশবেই সেই জ্ঞান গম্ভীর মহিমামণ্ডিত মূর্ত্তির পদতলে স্বীয় মস্তক উৎসর্গীকৃত করিয়াছিলেন। কুমারী হ্যান তাঁহাকেই আপন উপদেষ্টা ও রক্ষক রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার জীবনী-লেখক শ্রীযুক্ত সিনেট মহোদয় বলেন :—

"অতি শৈশবেই কুমারী হ্যান কোন ইন্দ্রিয়াতীত শক্তি দ্বারা সদা পরিরক্ষিত হইয়া থাকিতেন;—এই রক্ষণী শক্তি, তাঁহা কোন বিশেষ বিপদের সম্ভবনা স্থলে প্রয়োজন হইবে, স্থূলভাবেই নানা প্রকার অদ্ভুত কার্য্যের অবতারণা করিত। একটী দৃষ্টান্ত দেখুন। তাঁহার শিশু কালের এই গল্পটী আমি অনেকবার তাঁহার নিজ মুখেই শুনিয়াছি। তাঁহার মাতামহের আবাসস্থল শরত্ন নগরস্থ প্রাসাদে একখানি চিত্র ছিল। চিত্রটী মাতুল বংশের কোন পূর্ব্বপুরুষের প্রতিমূর্ত্তি। এই চিত্রখানি দেখিবার জন্য তাঁহার বড়ই কৌতূহল জন্মে। একটী উচ্চ প্রকোষ্ঠে প্রাচীর গাত্রে খুব উপরে এই চিত্রটী সংলগ্ন ছিল এবং ইহার সম্মুখভাগ বস্ত্রাচ্ছাদিত ছিল। কুমারী হ্যান তখন অতি ক্ষুদ্র শিশু মাত্র, কিন্তু সঙ্কল্প সাধনে অত্যন্ত দৃঢ়ব্রত। ঐ চিত্রখানি দেখিতে তাঁহাকে নিষেধ করা হয়। তিনিও সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন, কখন গৃহ লোকশূন্য হয়। এক সময় সুবিধা বুঝিয়া স্বীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। একটা টেবিল দেয়ালের কাছে টানিয়া নিলেন, তদুপরি আর একটা ছোট টেবিল স্থাপন করিলেন, সর্ব্বোপরি একটা চেয়ার বসাইলেন এবং আস্তে আস্তে এই দোদুল্যমান সোপানোপরি আরোহণ করিলেন। এত করিয়াও তিনি সেই উচ্চস্থিত চিত্রটীকে অঙ্গুলির দ্বারা ছুঁইতে পারিলেন মাত্র। এক হস্তে সেই ধূলিময় প্রাচীরের উপর ভর দিয়া, অপর হস্ত দ্বারা কোন ক্রমে চিত্রাবরক বস্ত্রখণ্ডকে সরাইয়া ফেলিলেন। চিত্র খানি দেখিবামাত্র তিনি সহসা চকিত ও কম্পিত হইয়া পড়িলেন, এবং তদবস্থায় কিঞ্চিৎ পশ্চাৎ হেলনেই সেই কম্পমান মঞ্চখানি উল্টাইয়া পড়িয়া গেল। তার পর সঠিক কি ঘটিল, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। কেন না, তিনি ভীত হইয়া

মাত্র একেবারে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া নিম্নে পতিত হন। যখন পুনরায় সংজ্ঞা লাভ হইল, তখন দেখিতে পাইলেন, তিনি মেজের উপর পড়িয়া আছেন, দেহে কিছুই আঘাত লাগে নাই, টেবিল দুটীতে চেয়ার খানা পূর্ব্বের ন্যায় যথাস্থানে রক্ষিত হইয়াছে, এবং চিত্রাবরক বস্ত্রখণ্ড পুনরায় চিত্রখানির উপর সংন্যস্ত হইয়া আছে। তিনি সমগ্র ব্যাপারটীকে অদ্ভুত স্বপ্নবৎ মনে করিতেই প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, চিত্র পার্শ্বে সেই উচ্চ ধূলিময় প্রাচীর গাত্রে তাঁহার ক্ষুদ্র করাঙ্ক চিহ্নিত হইয়া রহিয়াছে॥

"আর একবারও, তখন তাঁহার বয়স কিছু কম চৌদ্দ বৎসর, এইরূপ আশ্চর্য্যভাবে তাঁহার জীবন রক্ষিত হয়। তিনি অশ্বপৃষ্ঠে ছিলেন, ঘোটকটী হঠাৎ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া এক দিকে ছুটিয়া যায়, তিনি পড়িয়া গেলেন, কিন্তু পা রেকাবে আটকাইয়া রহিল, এ অবস্থায় মৃত্যু অনিবার্য্য। কিন্তু তিনি সুস্পষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন যেন কোন অজ্ঞাত শক্তি তাঁহাকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে অতিক্রম করিয়া এই শক্তি যেন তাঁহাকে উত্তোলন করিয়া রাখিয়াছে, পড়িতে দিতেছে না। যদি এরূপ বিস্ময়কর গল্প সংখ্যায় দুটী একটী হইত, তাহা হইলে এই জীবনচরিতে আমি উহার উল্লেখ করিতাম না। কিন্তু অতঃপর দৃষ্ট হইবে যে, ব্লাভাস্কীর জীবন সম্বন্ধে যে কোন ব্যক্তিই কিছু বলিয়াছেন বা লিখিয়াছেন, তিনি বহুল পরিমাণে এইরূপ বিস্ময়কর ঘটনারাশি বর্ণনা করিয়াছেন। সুদীর্ঘ ভ্রমণের পর ব্লাভাস্কী যখন রুসিয়াতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখন যে সকল ঘটনা সংঘটিত ও লিপিবদ্ধ হয়, তাহাতে উপরোক্ত বাক্যের জাজ্বল্যমান প্রমাণ বর্ত্তমান। ঐ সকল বিবরণ তাঁহার আত্মীয়বর্গের নিকট প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে; এগুলির অলৌকিকত্বের তুলনায় তাঁহার স্বয়ং-কথিত দুই একটী শৈশব-ঘটনা কিছু নয় বলিলেই হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি যে এই সকল ঘটনার উল্লেখ করিতেছি, সে শুধু গল্পের জন্য নহে, মাদাম ব্লাভাস্কীর সহিত তদুক্ত "মহাপুরুষমণ্ডলীর" আশৈশবে কি রূপ সম্বন্ধ বিদ্যমান, তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইবার জন্য। মহাপুরুষগণ স্থূল শরীরে তখনও তাঁহার নিকট ব্যক্ত না হইয়া থাকুন, তিনি তাঁহাদিগকে সজীব মানুষ বলিয়া তখনও না জানিয়া থাকুন, কিন্তু সূক্ষ্মাকারে সদাই সেই শৈশব-জীবনে তিনি তাঁহাদের বিলক্ষণ পরিচয় পাইতেন।

"পূর্ব্বোদ্ধৃত বিবরণে দেখা গিয়াছে যে, তাঁহার কার্য্যে কেহ বাধা না জন্মাইলে তিনি একটা গৃহকোণে গিয়া বসিয়া থাকিতেন, এবং যেন নিজের সঙ্গেই নিজে কথা কহিতে থাকিতেন,—তাঁহার আত্মীয়েরা বহুবার ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। নিজে কিন্তু বলিতেন যে, তাঁহার সমবয়স্ক ক্রীড়া-সহচরদের সহিত গল্প করেন। অন্য কেহ না দেখিতে পাইলেও, তাঁহার নিকট সেই ক্রীড়া-সঙ্গীরা জীবন্ত বলিয়াই প্রতীয়মান হইত। একটী ক্ষুদ্র কুব্জ-পৃষ্ঠ বালক তাহার প্রিয়তম সহচর হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার এই অদৃশ্য বন্ধুটীকে একটু আদর সম্ভাষণ করিবার জন্য তিনি ধাত্রী ও আত্মীয়গণকে কতই অনুরোধ করিতেন। তাহারা এই অনুরোধ রক্ষার্থ কেন যে কিছু মাত্র যত্ন করেনা, ইহা তিনি বুঝিতে না পারিয়া যারপর নাই বিরক্ত হইতেন। বস্তুতঃ কেহই সেই জীবটীকে দেখিতে পাইত না, আদর করিবে কাহাকে?

কিন্তু তিনি এই বালকটীকে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতেন, তাহার কথা শুনিতে পাইতেন, এবং তাহার সহিত আমোদ আহ্লাদ করিতেন, আবার কখনও বা তৎকর্ত্তৃক প্রবোচিত হইয়া কিঞ্চিৎ দুষ্টামি করিয়া বসিতেন। এইরূপ দ্বিভাবাপন্ন দৃশ্যাদৃশ্যময় শৈশব-জীবনের মধ্যেই তিনি সময়ে সময়ে অপর একজন বয়স্ক ব্যক্তির দেখা পাইতেন। এই ব্যক্তি যেন তাঁহার রক্ষক ও অভিভাবক স্বরূপ দণ্ডায়মান হইতেন। তাঁহার গম্ভীর মূর্ত্তি জীবনের প্রথম ভাগেই ব্লাভাস্কীর চিত্তের উপর অসীম প্রভুত্ব স্থাপন করিল। ইনি চিরকাল এক ভাবেই উপস্থিত হইতেন, কখনও তাঁহার আকৃতির পরিবর্ত্তন হয় নাই। কিছু কাল পরে তিনি তাঁহাকে সজীব স্থূল দেহেই দেখিতে পাইয়াছিলেন, এবং দেখিয়া ভাবিতেন যেন বাল্যে ইহার দৃষ্টি-তলেই তিনি প্রতি-পালিত হইয়াছেন।"

কি আশ্চর্য্য। সুদূর রুসিয়া দেশের একজন খ্রীষ্টান বালিকা এই সকল প্রাচ্য মহাপুরুষের দর্শন পাইয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, তাঁহারাই ব্লাভাস্কীকে শিশুকাল হইতে সযত্নে রক্ষা করিয়া অভীষ্ট পথে পরিচালিত করিতে-ছিলেন। আমরা পরে দেখিতে পাইব যে, ব্লাভাস্কীর প্রভু সেই মহাপুরুষ ভারতবর্ষীয় লোক। ইঁহার সহিত ব্লাভাস্কীর যে জন্মান্তরীণ সম্বন্ধ বিদ্যমান, তাহাতে সন্দেহ নাই। পূর্ব্ব জীবনের উপদেশকেই ইহজীবনের পথপ্রদর্শক হইয়া তাঁহার দ্বারা জগতের হিতকর মহৎ কার্য্য সকল সম্পন্ন করাইয়া লইতেন। যদি তাহাই হয়, তবে এরূপ অনুমান করা নিতান্ত অন্যায় নহে যে, ব্লাভাস্কীর পূর্ব্ব জন্মের শিক্ষা দীক্ষা ভারতেই সম্পন্ন হইয়াছিল, এবং বিশেষ উদ্দেশ্য বশেই তাঁহাকে পাশ্চাত্য ভূমিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। যাহা হউক, জীবের এবম্বিধ জন্মগতি ও জাত্যন্তর পরিণতি এরূপ রহস্যময় যে, উহার উদ্ঘাটন করা স্থূলদৃষ্টি-সম্বল সাধারণ মানুষের কর্ম্ম নয়। ব্লাভাস্কীর পরবর্ত্তী জীবনে এতদ্বিষয় আরও একটু স্পষ্টীকৃত হইবে।

শ্রীদুর্গানাথ ঘোষ।

আমাদের দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থা।

আমাদের দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থা আলোচনা করিলে, বড়ই কষ্ট হয়। একটা একটা করিয়া আলোচনা করিব। যাহাতে কষ্ট হয়, এমন কার্য্যে প্রবৃত্তি কেন? তাহার কারণ এই যে, এরূপ আলোচনা ব্যতীত দেশের দুর্দ্দশা অপনীত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কি কি বিষয়ে দেশের দুর্দ্দশা, তাহা অনুসন্ধান করা আবশ্যক। অনেক বিষয়েই দেশের দুরবস্থা। কোনটার বিষয় বলিব? প্রধান প্রধান কয়েকটী বিষয় বলি।

প্রথম, আমাদের স্ত্রীলোকদের অবস্থা চিন্তা করিলে, যথার্থই অতিশয় মনের ক্লেশ পাইতে হয়। স্ত্রীলোকদের কি কি বিষয়ে দুর্দ্দশা? প্রথম, তাহাদের ঐকান্তিক মূর্খতা। নিরক্ষর স্ত্রীলোক যে কত, তাহা জানি না। সেন্‌সস্ রিপোর্টে নিরক্ষর স্ত্রীলোকের সংখ্যা কত দেওয়া হইয়াছে, জানি না, কিন্তু ইহা সত্য যে, এখনও নিরক্ষর স্ত্রীলোকই অধি-কাংশ। কেবল নামটা স্বাক্ষর করিতে পারে, এমন স্ত্রীলোকও অল্প। পুস্তক পড়িতে পারে

ও চিঠিপত্র লিখিতে পারে, এমন স্ত্রীলোকের সংখ্যা অতিশয় অল্প। বিদ্যাবতী স্ত্রীলোকের তো কথাই নাই। বোধ হয়, তাহা অঙ্গুলীতে গণনা করা যায়।

তারপর স্ত্রীলোকের বিবাহ বিষয়ে কয়েকটী কথা। বিবাহ সম্বন্ধে স্ত্রীলোকের দুর্দ্দশার একশেষ। স্বাধীনতার লেশমাত্র নাই। প্রথম, বাল্যবিবাহ। ইহা ভারতবর্ষব্যাপী বলিলেই হয়। অল্প বয়সে বিবাহের জন্য তাহাদের যে কত কষ্ট, তাহা কে বলিবে? একটী গোপনীয় কথা এখানে বলা আবশ্যক। বালিকা যখন নিতান্ত নির্ম্মল-ভাবাপন্ন এবং তাহার স্বামী যখন অপেক্ষাকৃত অধিকতর বয়স্ক, তখন নির্দ্দোষী বালিকাকে বহু কষ্ট সহ্য করিতে হয়। এ সকল কথা প্রায় সকলেই জানেন, কিন্তু কেহই প্রকাশ করিতে চান না। আপনার আত্মীয় বালকের নিন্দা, অতি গোপনীয় নিন্দা, প্রকাশ করিলে লোকে কি বলিবে? গোপনীয় কথা গোপনেই থাকে, কেবল নির্দ্দোষী বালিকা যন্ত্রণা ভোগ করে।

কত বলিব? যুবা স্বামী। শিশু কিম্বা বালিকা স্ত্রী একত্রে শয়ন করিতে দেওয়ার যে কি ফল, তাহা কে না বুঝিতে পারেন? অথচ প্রকাশ করিয়া বলিবার উপায় নাই। ক্রমাগত কেবল বালিকারা যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, কেহ তাহা দেখিয়াও দেখে না। হায়! বিধাতা, তোমার রাজ্যে এ অত্যাচার আর কতকাল থাকিবে!

দ্বিতীয় কথা। বালিকার বৃদ্ধ পতি। সেও এক বিষম যন্ত্রণা। এ কথায় লোকে বলিবে, এখন ওরূপ বিবাহ অতিশয় হ্রাস হইয়া গিয়াছে, অথবা নাই বলিলেই হয়। আমি একথা স্বীকার করি না। আমার নিজের অভিজ্ঞতা দ্বারা যাহা জানি, তাহার সংখ্যা যদি গণনা করি, তাহা হইলেও শতাধিক হইবে। হে পরমেশ্বর! কত দিনে এই বালিকাগণ তাহাদের বৃদ্ধ পতির হস্ত হইতে মুক্ত হইবে, তুমিই জান।

তৃতীয় কথা। "বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা", সে উভয় পক্ষেই যন্ত্রণা। তরুণী ভার্য্যার বৃদ্ধ স্বামী ভাল লাগিবে কেন? বৃদ্ধের ভাল লাগিতে পারে, কিন্তু তরুণী ভার্য্যার হস্তে অনেক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। শেষে বৃদ্ধ বয়সে বিবাহের জন্য অনেক অনুতাপ করিতে হয়। পরিবারের কলঙ্ক পর্য্যন্ত হয়।

চতুর্থ কথা। বৃদ্ধবিবাহের সংখ্যা বৃদ্ধি দ্বারা বিধবার সংখ্যা বৃদ্ধি, এবং বিধবার সংখ্যা বৃদ্ধিদ্বারা দেশে দুর্নীতি বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিধবার সংখ্যা বৃদ্ধিদ্বারা সমাজে পাপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। আর সমাজের বাহিরে পতিতা নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি। পতিতা নারীকে অনেকেই পাপিনী বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন, কিন্তু এ কথা কি সত্য নহে যে, তাহাদের মধ্যে অনেকেই সমাজের অত্যাচারে ঐরূপ অবস্থায় পতিতা? ঐ প্রকার অনেক পতিতা নারী, সমাজের অত্যাচারের ফল মাত্র। সমাজের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিতা হইয়া এরূপ কত স্ত্রীলোক যে কত কষ্টভোগ করিতেছে, তাহা কে বর্ণনা করিবে? শারীরিক পীড়া, মানসিক যন্ত্রণা, এসকলের তো অবধি নাই, যৌবন ও স্বাস্থ্য বিগত হইলে ভীষণ দরিদ্রতার আক্রমণে তাহারা মুহ্যমান!

পঞ্চম। গৃহস্থের গৃহে যে সকল বিধবা নারী বাস করেন, তাঁহাদের কথা আর কি বলিব? অনেকস্থলেই তাহাদের ক্লেশের সীমা নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সুমহৎ সংস্কারের সূচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার একান্ত প্রয়োজনীয়তা দুর্ভাগ্য দেশ বুঝিল কই? তিনি কয়জন বিধবাকে উদ্ধার করিতে

পারিয়াছেন? লক্ষ লক্ষ, বিধবা নারী চক্ষে অশ্রুধারা বহিতেছে। লক্ষ লক্ষ বিধবা নারীর দীর্ঘনিঃশ্বাসে নিশীথের শীতল বায়ু উত্তপ্ত। লক্ষ লক্ষ বিধবা নারীর নীরব ক্রন্দনে ভারত-মাতা কাতর।

ষষ্ঠ। এখন পুরুষের দুঃখের কথাও কিছু বলি। দরিদ্রতার কষ্ট, স্ত্রী-পুরুষ, উভয় জাতিই ভোগ করিতেছে। এমন পরিবার দেখিতেছি, যাহারা সকল দিন খাইতে পায় না। শিশু দুগ্ধাভাবে কষ্ট পাইতেছে।

দেশের যতপ্রকার দুর্গতি আছে, তন্মধ্যে দরিদ্রতাই অনেক প্রকার দুর্গতির মূল। দরিদ্রতা হইতে কি না হয়? দরিদ্রতার জন্য লোকের ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান থাকে না। পেটের জ্বালায় মানুষ কি না করিতে পারে? দেখিয়াছি, পেটের জ্বালায় স্ত্রীলোক আপনার সতীত্ব পর্য্যন্ত দিয়াছে। যাহারা উত্তম খায়, উত্তম পরে, তাহাদের ধর্ম্ম করা অপেক্ষাকৃত সহজ। কত স্ত্রীলোক উদরের যন্ত্রণায় কুপথে চলিয়া গিয়াছে। ইহা অতি সত্য কথা। কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। জন-সমাজের যে অবস্থা, তাহাতে সকলের পক্ষে সকল অবস্থায় ধর্ম্মরক্ষা করা সম্ভব নহে। কেহ হয় তো বলিবেন, প্রতিকূল অবস্থার সহিত যুদ্ধ করিয়া ধর্ম্মকে রক্ষা করা উচিত। এই সকল লোককে বলি, তোমরা সুখে খাইয়া পরিয়া আরামে দিনযাপন করিতেছ। প্রকৃত দরিদ্র লোকের পক্ষে ধর্ম্ম রক্ষা করা যে কত কঠিন, তাহা তোমাদের বুঝা সহজ নহে। তোমরা যদি তাহাদের অবস্থায় পড়িতে, তাহা হইলে তাহাদের অপেক্ষাও দুষ্কর্ম্মান্বিত হইতে। যাহারা সুখে আছে, তাহারা দুঃখীর দুঃখ কেমন করিয়া বুঝিবে? উপদেশ দেওয়া, তিরস্কার করা, সহজ; কিন্তু অবস্থায় পড়িলে তাহা অতিক্রম করিয়া কার্য্য করা সহজ নহে। অন্যে বিপদ, বিঘ্ন, কষ্ট বা প্রলোভনে পড়িয়া যে পাপ করিয়াছে, আমি যদি অবিকল সেই অবস্থায় পড়িতাম, তাহা হইলে, সেই পাপ করিতাম কিনা, তাহা কি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি? সে অবস্থায় পড়ি নাই বলিয়া অক্লেশে তাহাকে নিন্দা ও তিরস্কার করিতেছি। লোকে যদি এইরূপ ভাবে পরস্পরের বিচার করে, তাহা হইলে, জগতে অনেক পরিমাণে ক্ষমা ও সদ্ভাব বৃদ্ধি হয়।

কে কাহার অবস্থা বুঝে? সকলে আপনার আপনার লইয়াই ব্যস্ত। পরস্পরের অবস্থা বুঝিতে পারিলে, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি হইত। জগতে সহানুভূতি অতিশয় অল্প। যদি সহানুভূতি থাকিত, তাহা হইলে পৃথিবীর কষ্ট যন্ত্রণা অনেক হ্রাস হইত।

দেশের অবস্থার বিষয় ভাবিতে গেলে, এমন অনেক কথা মনে হয়, যাহা ভদ্র সমাজে বলা যায় না। স্ত্রীলোকের দুঃখের কথা অনেক বলিয়াছি। পুরুষের দুঃখও অনেক। স্ত্রীলোক ও পুরুষ উভয়ে মিলিয়া অনেক দুঃখ ভোগ করিতেছে। দুঃখের সীমা দেখিতে পাই না। অসহ্য যন্ত্রণায় আত্মহত্যা পর্য্যন্ত ঘটিতেছে। দেশের অবস্থা যাহাতে ভাল হয়, লোকের কষ্ট যাহাতে হ্রাস হয়, সেজন্য কয়জন লোক চেষ্টা করে? সকলে আপনার আপনার লইয়া ব্যস্ত। কত দিনে এদেশের প্রতি পরমেশ্বরের কৃপাদৃষ্টি পড়িবে, কে জানে? দুঃখে, পাপে, কুসংস্কারে সংসার অন্ধকার।

প্রকৃত দেশহিতৈষীর সংখ্যা বড় অল্প। যথার্থ দেশহিতৈষণা যাহাকে বলে, তাহা এদেশে কোন্ কালে ছিল বলিয়া মনে হয় না। বর্ত্তমান সময়ে ইংরেজী শিক্ষার গুণে

দেশহিতৈষণা কিছু কিছু বৃদ্ধি হইতেছে। এ কথায় অনেকে বিরক্ত হইবেন। কিন্তু ইহা অত্যন্ত সত্য। এই দেশহিতৈষণার উন্নতি ব্যতীত, কখনই প্রকৃতভাবে দেশের উন্নতির সম্ভাবনা নাই। দেশহিতৈষণা যে এদেশে ছিল না, তাহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। অধিক কথার প্রয়োজন নাই। একটা কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এদেশে 'দেশ' বলিয়া একটী বিশেষ সীমার মধ্যবর্ত্তী স্থানকে সকলেই সমভাবে কখন মনে করেন নাই। কাহারও পক্ষে একটী গ্রাম তাঁহার দেশ। কাহারও পক্ষে একটী নগর তাঁহার দেশ। প্রশস্ত ভাবে কোন প্রদেশকে দেশ বলিয়া কেহ কখনও মনে করিত কিনা, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ সন্দেহ। আমার দেশ বলিলেই লোকে যেখানে তাঁহার নিবাস, তাহাকেই মনে করিতেন। দেশের উপকার বলিলে যে স্থানে তাঁহার নিবাস, সে স্থানের উপকার মনে করিতেন। যদি হুগলীর লোক বলিতেন যে দেশের উপকার করিতে হইবে, তাহা হইলে এই বুঝিতে হইত যে, হুগলী ও তাহার অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী স্থানের লোকের উপকার করিতে হইবে। দেশ অর্থ, যাঁহার যেখানে নিবাস। শান্তিপুরের লোক যদি বলিতেন, আমাদের দেশের হিতসাধন কর্ত্তব্য, তাহার এই অর্থ বুঝিতে হইত যে, শান্তিপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী লোকদিগের উপকার করার কথা হইতেছে। দেশ বলিলে সমস্ত বাঙ্গালা দেশ কখনই বুঝাইত না। বঙ্গদেশ বলিলে পূর্ব্ব বাঙ্গালা বুঝাইত। কিন্তু একজন লোক যদি ঢাকায় বসিয়া বলিতেন, আমার দেশের হিত করা আবশ্যক, তাহা হইলে, যে স্থানে তাঁহার নিবাস, অর্থাৎ সিলেট হউক বা ফরিদপুর হউক বা বরিসাল হউক, বা বর্দ্ধমান হউক, সেই স্থানের হিত সাধন করিতে হইবে।

আজ কাল যে প্রশস্তভাবে দেশের হিত সাধনের কথা হয়, ইহা সম্পূর্ণ নূতন। ইহা ইংরেজী শিক্ষার ফল। দেশের হিত বলিলে সমগ্র বাঙ্গালা দেশের হিত, অথবা সমগ্র ভারতের হিত, ইহা আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কখনই বুঝিতেন না। দেশ বলিলে পশ্চিম বাঙ্গালা এবং পূর্ব্ব বাঙ্গালা, উভয় মিলিয়া যে একটী দেশ, এমনও বুঝাইত না। দেশ অর্থ, যার যেখানে নিবাস। যদি বিষ্ণুপুরের কোন লোক কলিকাতায় আসিতেন, তিনি নিশ্চয়ই কলিকাতাকে বিদেশ মনে করিতেন।

সমস্ত ভারতবর্ষকে স্বদেশ মনে করা এখনও শিক্ষিত লোকের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। কতদিনে হইবে, ঈশ্বর জানেন। সুতরাং সমগ্র ভারতকে স্বদেশ ভাবিয়া তাহার হিতের জন্য যত্ন করা এখনও শিক্ষিত লোকদিগের পক্ষেও স্বাভাবিক হয় নাই। পশ্চিম বাঙ্গালাবাসী ও পূর্ব্ব বাঙ্গালাবাসী, এ উভয়ের স্বদেশবাসী বলিয়া সদ্ভাব সঞ্চার হওয়া এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। ইহা নিশ্চয় যে, ব্রাহ্মসমাজ এ কার্য্য অনেকটা করিয়াছেন ও ভবিষ্যতে আরও করিবেন। কেবল পশ্চিম বাঙ্গালা ও পূর্ব্ব বাঙ্গালা কেন? ব্রাহ্মসমাজ সমগ্র ভারতকে এক করিতেছেন।

আমরা দেশের দুর্দ্দশার কথা বলিতে গিয়া আনুষঙ্গিক রূপে উপরি-উক্ত কথাটী আনিয়া ফেলিয়াছি। বাস্তবিক দেশের দুরবস্থা দূর করিতে হইলে সমগ্র ভারতব্যাপী দেশহিতৈষণা ব্যতীত এ দেশের প্রকৃত মঙ্গল কখনই হইতে পারেনা। যখন মাদ্রাজ হইতে পেসোয়ার পর্য্যন্ত সকল ভারতবাসীর হৃদয় এক স্বদেশানুরাগ সূত্রে গ্রথিত হইবে, তখনই

বুঝিব। যে দেশের প্রকৃত কল্যাণের দিন আসিয়াছে।

দেশের দুর্গতির কথা যত চিন্তা করি, ততই দেশের দুর্গতির কথা মনে হয়, যেন ইহার শেষ নাই। বাস্তবিক বহুকাল হইতে নানা কারণে এ দেশের এত দুর্গতি ঘটিয়াছে যে, গণনা করিয়া শেষ করা যায় না। কয়েকটী প্রধান প্রধান দুর্দ্দশার কথা বলিলাম। আরও অনেক বলিতে পারি। কিন্তু বলিয়া কি হইবে? কে শুনে? কে দেখে? দেশের জন্য কয়জন লোকের প্রাণ কাঁদে? সকলেই আপনার আপনার লইয়া ব্যস্ত; কে কাহার সংবাদ লয়? স্বার্থপরতা দেশের লোকের স্বভাবকে এমন কলঙ্কিত করিয়াছে যে, তাহা স্মরণ করিলেও কষ্ট ও লজ্জা হয়। আমাদের কত অহঙ্কার। কিন্তু অহঙ্কার করিবার যে কি আছে, তাহা তো জানি না। যাহা পূর্ব্বকালে ছিল, তাহা গিয়াছে। এখন অহঙ্কার করিবার কি আছে? পূর্ব্বপুরুষ বড় লোক ছিলেন, তাহাতে আমাদের কি? তাহাতে আমাদের অহঙ্কার না করিয়া, বরং লজ্জিত হওয়া উচিত। এমন উচ্চবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া আমরা এত হীন হইয়াছি, ইহার তুল্য লজ্জার কথা আর কি আছে? আমরা ঋষি মুনিদের সন্তান, তাহাতে আমাদের গৌরব না হইয়া লজ্জার বিষয় হওয়া উচিত। আমরা আর্য্য জাতি বলিয়া অহঙ্কার করি। কিন্তু আর্য্য বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া আমাদের কি হইয়াছে? এমন কি লক্ষণ আমাদের আছে, যাহাতে আমরা আর্য্য বলিয়া গৌরব করিতে পারি? পূর্ব্বপুরুষ বড় লোক ছিলেন, তাহাতে আমাদের কি? সেই পূর্ব্বপুরুষেরা যদি আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিতে পান, তাঁহারা কি মনে করেন? তাঁহারা কি আমাদিগকে বংশের কুলাঙ্গার বলিয়া মনে করিবেন না? তবে আমাদের অহঙ্কার কিসের জন্য? জ্ঞানে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে আমরা জগতের মধ্যে বড়? জগতের সভ্য-জাতি সকলের সহিত তুলনা করিলে, আমাদের এমন কি আছে, যাহা দেখিয়া বলিতে পারি যে, আমরাও সভ্য জাতিগণের মধ্যে সভ্য বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য? এখন আমরা পরমেশ্বরের কৃপায় ক্রমে ক্রমে উঠিতেছি। কিছু আশা হইয়াছে। যদি উন্নতির জন্য একান্ত যত্ন হয়, দীর্ঘকালে কিছু হইতে পারে। কিন্তু এখন এমন কিছু নাই, যাহার জন্য আমরা অহঙ্কার করিতে পারি! ইংরাজী শিক্ষা ও ব্রাহ্মসমাজের কৃপায় যাহা হইয়াছে, তাহার জন্যই আশা হইতেছে যে, কালে কিছু হইতে পারে। এখন কেবল উন্নতির জন্য যত্ন ও চেষ্টা, ও কৃপাময় পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা। তিনি কৃপা করিয়া যদি সুদিন আনিয়া দেন, তবেই আমরা সভ্যজগতের সম্মুখে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারি।

হে প্রভো! এই দীনহীন কাঙ্গাল জাতিকে কৃপা কর। আর কতদিন আমরা এই হীনভাবাপন্ন হইয়া, জগতের নিকট অপদস্থ হইয়া থাকিব। আর কত দিন আমরা অজ্ঞান-অন্ধকারে ডুবিয়া থাকিব। আর কতদিন কুসংস্কারে মজিয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইব। আর কত দিন আমরা দরিদ্রতার ঘোর যন্ত্রণা সহ্য করিব? আর কত দিন এদেশের নরনারীকুল নানা প্রকার কষ্ট যন্ত্রণায় দিন কাটাইবে? কে তাহাদের পানে তাকায়? তুমিই আমাদের উপায়। তোমা ভিন্ন আর কেহ নাই। কৃপা কর, কৃপা কর, কৃপা কর।

কোন পরলোকবাসী আত্মা—
মিডিয়ম শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

যুক্তি, অযুক্তি, কুযুক্তি।

এক একজন স্বদেশপ্রেমিক আছেন, তাঁহারা ভাবেন, স্বদেশ তাঁহাদের একচেটিয়া নিজস্ব। অপরে স্বদেশের কল্যাণের জন্য যদি কিছু করিতে চেষ্টা করে, তাঁহারা উপহাস ও বিদ্রূপ-হাসি হাসিয়া বক্তৃতা-ব্যঙ্গে স্বদেশ-সেবা শেষ করেন, এবং যুক্তিবলে জন্মভূমিকে মুক্তিদান করিয়া ঘন করতালিবাদ্যে ধন্যবাদ লাভ করেন। তাঁহাদের যুক্তি, অযুক্তি বা কুযুক্তির আচরণ যতই চাকচিক্যময় ও মনোহর হউক না কেন, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাহার অন্তঃসারশূন্যতা অনায়াসেই বুঝিতে পারে। তাঁহাদের যুক্তি সত্যের অনুসন্ধানের চেষ্টা না করিয়া মত-প্রতিষ্ঠা করিতে তৎপর হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ গত ফাল্গুন মাসের বঙ্গদর্শনের একটী প্রবন্ধের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

সকলেই অবগত আছেন, মাননীয় শ্রীযুক্ত গোখেলে ভারতে জনসাধারণের মধ্যে নিম্ন-শিক্ষা প্রচারের জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন। এজন্য তিনি বড়লাট সাহেবের ব্যবস্থাপক সভায় এক আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিয়াছিলেন। সে আইন পরিগৃহীত হয় নাই। আইনের দোষগুণ বিচার এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। গোখেলের সাধু চেষ্টার প্রতিবাদ করিতে যাইয়া বঙ্গদর্শনের লেখক, স্বরাজ-প্রতিষ্ঠাতা, শ্রীহট্টের শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল যে সকল শ্রুতিমধুর কুযুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহার অসারতা প্রদর্শন করা আবশ্যক বোধ হইতেছে।

বাক্যমল্ল বঙ্গ-যুবক-সম্প্রদায়ের নেতা বিপিন বাবু বলেন, "যাঁহারা শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের দেশের অবস্থা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নাই। তাঁহারা লিটারেসি (literacy) ও এডুকেশন (education) উভয়কে এক বস্তু বলিয়া মনে করেন। আমাদের দেশের কৃষকেরা 'কথ' পড়িতে না পারিলেও তাহারা শিক্ষিত ও জ্ঞানী। আমাদের সনাতন শাস্ত্র শ্রুতি-পরম্পরা প্রতিষ্ঠিত। আমাদের সাধারণ লোকেরা মুখে মুখে সজীব সত্য শিক্ষা করিতেছে। আমাদের দেশের সাধারণ লোক অপর দেশের সমশ্রেণীর লোক অপেক্ষা কোন বিষয়ে হীন বা অজ্ঞ নহে। কেবল বুদ্ধিবৃত্তির তারতম্য দ্বারাই শিক্ষার পার্থক্য বোঝায় (!)। এই মাপে বিলাতের সাধারণ লোকেরা কণা মাত্রও দাঁড়িপাল্লা ঝুকিয়া পড়িবে না। ইংরাজ পার্লেমেণ্টের খবরাখবর কিছু রাখেন, কিন্তু রাজনীতি ও সমাজনীতির জটিল সমস্যা কণা মাত্রও বুঝেন না। কলকারখানার কর্ত্তারা মেষপালের ন্যায় অধীনস্থ শ্রমজীবিদিগকে ভোট দিবার জন্য তাড়াইয়া লইয়া যান। আমাদের মাতৃস্থানীয়ারা 'কেতাব পড়া' শিক্ষা লাভ করেন নাই। অথচ তাঁহারা আমাদের কন্যাস্থানীয়া শিক্ষিতা মহিলাদিগের অপেক্ষা স্বল্প বুদ্ধিমতী বা স্বল্পজ্ঞতা বা স্বল্প কর্ম্ম-কুশলা ছিলেন না। উপর হইতে ও বাহির হইতে বাহিরের আদর্শে ও উপর-ওয়ালার আদেশেও সমাজের উপর সংস্কারের বোঝা চাপাইবার যে চেষ্টা হইতেছে, তার তীব্র প্রতিবাদ হওয়া আবশ্যক। প্রয়োজন

উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে এই আয়োজনের ব্যবস্থা কৃত্রিম, বহির্ম্মুখীন ও অকল্যাণকর পরধর্ম্ম। উহা সত্য সত্যই ভয়াবহ।" কিন্তু তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, "বৌদ্ধ-যুগে দেশের সাধারণ স্ত্রী-পুরুষে লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। কোম্পানীর রাজত্বের প্রারম্ভে বাঙ্গলাদেশের বৈষ্ণব-মণ্ডলীর মধ্যে সাধারণ শিক্ষা ও স্ত্রীশিক্ষা উভয়ই অনেকটা প্রচলিত ছিল।"

বিলাতের সমালোচনা করিয়া পাল মহাশয় উপসংহার করিয়াছেন যে, "সেখানে সর্ব্বজনীন শিক্ষার বিস্তারের ফলে সমগ্র সমাজের বিদ্যাবুদ্ধি ক্রমশঃ ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িতেছে। ইংরাজি-সাহিত্য ক্রমশঃই অতিশয় লঘু হইয়া উঠিয়াছে। সমাজের রুচি বিকৃত হইয়া পড়িতেছে। অতএব আমাদের দেশে জনসাধারণের মধ্যে বর্ণ-পরিচয়-প্রচারের চেষ্টা হইলেও সেইরূপ ফল উৎপন্ন হইবে।" ইত্যাদি।

উদ্ধৃত প্রবন্ধের মর্ম্মাংশ হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, লেখক 'একচোখো' যুক্তির আবর্ত্তে পতিত হইয়া যে সকল কথা লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নিজের বিলাতীশিক্ষার প্রতি মন্তব্য সপ্রমাণ ও সমর্থিত হইয়াছে। তিনি বর্ণজ্ঞানের প্রতি অযথা দোষারোপ করিয়া জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের বিরুদ্ধে সমর-ঘোষণা করিয়াছেন। ইহা স্বরাজতন্ত্রী স্বদেশভক্তের উপযুক্ত চেষ্টা, সন্দেহ নাই। তিনি ভারতের যে যুগের সহিত বর্ত্তমান যুগের তুলনা করিয়াছেন, তখন ভারতে ইংরাজ-শাসন ছিল না, মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন ছিল না, পোষ্টাফিস-রেল-তার ছিল না, উকীল মোক্তার বারিষ্টারের ছড়াছড়ি ছিল না, রাজনৈতিক বক্তৃতা ও বক্তৃতা ছিল, স্বায়ত্তশাসনের ঘটা ছিল না, সংবাদ পত্র ও মাসিক পত্রের প্রচার ছিল না, বাষ্প-তড়িত-চালিত মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, বাজার সহিত বিবাদ করিয়া বিলাতী মালের বয়কট ছিল না, ন্যাশন্যাল স্কুল ছিল না, সমাজসংস্কারক বক্তা ও লেখক ছিল না, কলকারখানার প্রাদুর্ভাব ছিল না, ব্রাহ্মসমাজ ও আর্য্যসমাজের ক্রিয়াশীলতা ছিল না, জীবন-সংগ্রামের 'তীব্রতা' ছিল না। এখন এ সকলই হইয়াছে। অবস্থার পরিবর্ত্তনে ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হওয়া উচিত কিনা, তাহা বিপিন বাবু চিন্তা করিয়া দেখিবেন। সময়ের গতি ও স্রোত, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনের ফল রামশ্যাম, জনজোজেফ কলমের তোড়ে বোধ করিতে চাহিলে পারিবেন কি? বৌদ্ধযুগে পালি বা মাগধী ভাষার দেশময় প্রচার হইয়াছিল, মুসলমান-যুগে আরবী ফারসীর প্রচার বাহুল্যে উর্দ্দু ভাষার উৎপত্তি হইয়াছিল, বর্ত্তমান ইংরাজীযুগে ইংরাজী ভাষা, ভাব, সভ্যতা এবং চিন্তা ও কার্য্য-প্রণালী ওতপ্রোতভাবে আমাদের ভারতীয় সমাজে প্রবিষ্ট হইতেছে। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া এবং কর্ণে অঙ্গুলী প্রদান করিয়া থাকিলেও,ইংরাজীপ্রভাব হইতে আমরা রক্ষা পাইব না। আরব্যোপন্যাসের দৈত্য আসিয়া যদি রাতারাতি ইংরাজ-রাজত্ব, বিলাতী সভ্যতা, যাতায়াতের সুগমতা ও স্কুল কলেজ মুছিয়া ফেলে, তাহা হইলেও আমরা পাশ্চাত্য প্রভাব এড়াইতে পারিব না। যেহেতু আমাদের অতীত শিক্ষা ও সংস্কার থাকিয়া যাইবে।

শিক্ষা মানব-জীবনের উদ্দেশ্য। শিক্ষা যেমন করিয়া হউক, একটা দাঁড়াইয়া যায়। পারিবারিক শিক্ষা, সামাজিক শিক্ষা, বৈষয়িক শিক্ষা, ধর্ম্মশিক্ষা কেহ চেষ্টা না করিলেও 'একটা কিছু' মোটের উপর প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে প্রতিফলিত হয়। কিন্তু তাহা পূর্ণ কি অপূর্ণ, প্রয়োজন সাধনে সমর্থ, কি অসমর্থ,

কুশিক্ষা কি সুশিক্ষা, বিচার্য্য বটে। বর্ত্তমান সময়ে অক্ষরজ্ঞান শিক্ষার প্রধান সোপান। স্কুল-কলেজ ছাত্রদিগকে লাইব্রেরীর দ্বারে পৌঁছাইয়া দিয়া জীবনে শিক্ষার বীজ বপন করিয়া দেয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার আরম্ভ, শেষ নহে। বিংশ শতাব্দীতে বর্ণজ্ঞান অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। পাল মহাশয় বর্ণজ্ঞানহীন কৃষক হইয়া বঙ্গের কোন পল্লীতে কিছুদিন বাস করিলে, এদেশে অক্ষর পরিচয়ের আবশ্যকতা আছে কিনা, বুঝিতে পারিতেন। সেকালে জমীদার প্রজাকে বঞ্চনা করিতেন না। কৃষকেরা কর দিয়া দাখিলা লইত না, লইবার প্রয়োজনও হইত না। এখন দাখিলা ভিন্ন এক কপর্দ্দক দিলেও তাহা আদালতে গ্রাহ্য হয় না। জমীদারের ধূর্ত্ত কর্ম্মচারিগণের দাখিলা প্রজাকে সতর্কতার সহিত পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ করিতে হয়। আজকাল পাথাটানা কুলীকে পর্য্যন্ত নাম সহি করিয়া মাহিনা লইতে হয়। যাতায়াতের সুগমতা বাড়িয়াছে বলিয়া এবং খাদ্যদ্রব্য দুর্ম্মূল্য হইয়াছে বলিয়া এখন চারিদিকে লোক ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বর্ণজ্ঞান-শূন্য বিদেশী মজুরকে মহুরী খরচা দিয়া বাড়ীতে পত্র লিখাইতে হয়। মালক্ষীদিগকে এখন ধোপার হিসাব রাখিতে হয় (পূর্ব্বে চাকরাণ ছিল), দুধের হিসাব রাখিতে হয় (পূর্ব্বে গৃহে কামধেনু ছিল), বাজার খরচ লিখিতে হয় (পূর্ব্বে কর্ত্তারা লিখিতেন।) এ সকল ঝঞ্ঝাট পূর্ব্বে আদৌ ছিল না। রেলে ষ্টীমারে যাইতে হইলে টিকিট কিনিয়া পড়িতে হয়, এবং দেখিয়া লইতে হয় উচিত মূল্য গ্রহণ করিয়া গন্তব্যস্থানের টিকিট দিয়াছে কি না। আজকাল গুলিসূতা, পরিধানের ধুতি, পায়ের চটিজুতা পর্য্যন্ত নম্বর ও মার্কা দেখিয়া কিনিতে হয়। একালে ও সেকালে কত অন্তর!

আমরা জানি এক ক্ষুদ্র মুসলমান-পল্লীতে (১) ৩০ বৎসর পূর্ব্বে একজনমাত্র মিঞা বর্ণজ্ঞান-শিক্ষা করিয়া 'মোল্লা' হইয়াছিল। এখন সেই গ্রামে স্কুল পাঠশালার চতুঃসীমায় পা না দিয়াও প্রায় ৮।১০ জন যুবককৃষক নিজের চেষ্টায় দাখিলা দলিল পড়িতে শিখিয়াছে। দুই এক জন একটু আধটু ইংরাজী ফোড়নও দিতে পারে। তথাপি তাহারা 'মুন্সী' পর্য্যন্ত হইতে পারে নাই। ইহা কি বর্ণজ্ঞান-শিক্ষার স্বাভাবিক প্রয়োজন সূচনা করে না?

এখন মুখে মুখে শিক্ষা দিবার লোকের অভাব, শিক্ষার্থীদিগের সময়েরও অভাব। দিন দিন অন্নচিন্তা চমৎকারিণী হইতেছে। বিষয় সকল ক্রমেই পল্লবিত ও জটিল হইতেছে। এ অবস্থায় মুখে মুখে শিক্ষা দেওয়া চলে কি? ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা কতক পরিমাণে সর্ব্বত্রই মৌখিক হইতেছে। আমাদের শাস্ত্র শ্রুতি-পরম্পরা প্রতিষ্ঠিত ছিল। যাহাদের দেশ হইতে এখন বর্ণজ্ঞানের পসরা আমাদের বাজারে আসিয়াছে, তাহাদের শাস্ত্রও পূর্ব্বে শ্রুতি-পরম্পরা প্রতিষ্ঠিত ছিল। আমাদের 'শিক্ষিত ও জ্ঞানী' কৃষকেরা (বর্ণজ্ঞান-হীন কৃষকেরা পাঠ করিয়া বিপিন বাবুর প্রতি অত্যন্ত খুসী হইবে।) মুখে মুখে সজীব সত্য শিক্ষা করে, বিলাতের মূর্খ, অজ্ঞান ও চিন্তাহীন কৃষকেরাও প্রাচীনকালে সজীব সত্য আস্বাদন করিয়া অমর হইত। এখন বর্ণজ্ঞান স্পর্শে তাহারা কুম্ভকর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ক্রমে যখন পশ্চিম দেশে ক্রিয়াশীলতা বাড়িল, চিন্তাশীলতা বৃদ্ধি হইল, উদ্ভাবনী বুদ্ধি বাড়িল, লিপিপ্রণালী প্রচারিত হইল, মুদ্রাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইল, তখন জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা আসিল।

(১) কাশিমাবাদ, ফরিদপুর।

বর্ণজ্ঞানী শিক্ষা অনেক পরিমাণে মৌখিক শিক্ষার স্থান অধিকার করিল। অধ্যাপক মিঃ ক্রল বলিয়াছেন, জর্ম্মণীতে তাঁহাদের গ্রামে ১৫০ অধিবাসীর মধ্যে পূর্ব্বে মাত্র তাঁহার পিতা লেখা পড়া জানিতেন। এখন (১৯০৫) সেই গ্রামে কেবল একব্যক্তি বর্ণজ্ঞানহীন, সে জন্মান্ধ। বিলাতে জনসাধারণের অক্ষর-শিক্ষা যে আধুনিক, ইহা হইতে বেশ বুঝা যায়। অতএব সাধারণ শিক্ষাকে বিলাতী মনে না করিয়া যুগধর্ম্ম বলিলে সত্যের অধিকতর নিকটবর্ত্তী হওয়া যায়।

শিক্ষার স্রোত সমাজের অভ্যন্তরে একবার প্রবাহিত হইলে, তাহা সহজে রুদ্ধ হয় না। পশ্চিম হইতে শিক্ষা-তরঙ্গ পূর্ব্বে আসিয়াছে—পারস্যে, ভারতে, চীনে, জাপানে, আমেরিকায় সর্ব্বত্র তাহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে। পুরুষ-সমাজ হইতে বর্ণজ্ঞান স্ত্রী-সমাজে সংক্রামিত হইয়াছে। বিপিন বাবুর বর্ণজ্ঞান-ফোবিয়া সত্বেও তাঁহার জানানা মহলে বালক বালিকার শিক্ষার জন্য কখনও শিক্ষয়িত্রী প্রবেশ করে নাই কি?

বর্ণ শিক্ষার পরেও যদি সাধারণশিক্ষার ত্রুটী থাকে, তাহা বর্ণ শিক্ষার ত্রুটী নহে। সামাজিক কলুষ যদি বর্ণশিক্ষার ফলে ভানুমতীর বাজির ন্যায় নিমিষ মধ্যে তিরোহিত না হয়, সে দোষ বর্ণশিক্ষার নহে। অন্য কারণে দেশে বিপ্লব উপস্থিত হইলে যদি বর্ণজ্ঞান প্রচারে তাহার শান্তি না হয়, সে অপরাধ বর্ণজ্ঞানের নহে। বিপিন বাবু এতবড় যুগপ্রবর্ত্তক হইয়া কিরূপে এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কথা বিস্মৃত হইয়াছেন, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

বিজ্ঞ বিপিন বাবু বলিয়াছেন, "কেবল বুদ্ধিবৃত্তির তারতম্য দ্বারাই শিক্ষার পার্থক্য বোঝায়।" এ যুক্তির সারবত্তা পাঠক বিবেচনা করিবেন। আমরা শুধু এইমাত্র জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে, কোন কোন দেশের লোক স্বভাবতঃ বুদ্ধিমান, অতএব তাহাদিগকে কি শিক্ষিত মনে করিতে হইবে? আর কোন কোন দেশের লোক খাদ্য, জল বায়ু, ব্যবসায় ও সামাজিক অবস্থাগুণে স্বভাবতঃ স্থূলবুদ্ধি, অতএব সহস্র শিক্ষিত হইলেও তাহাদিগকে অশিক্ষিত বলিতে হইবে কি? বিপিন বাবু শ্লেষ করিয়া বলিয়াছেন, বিলাতে কলখানার লোকেরা বর্ণজ্ঞানসম্পন্ন হইলেও কলের কর্ত্তারা তাহাদিগকে মেষপালের ন্যায় পরিচালন করেন। আমাদের দেশের 'বুদ্ধিমান, জ্ঞানী, সজীব সত্যে শিক্ষিত' কৃষকদিগকে, জমীদারেরা, ইংরাজশাসন বদ্ধমূল হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, কি ভাবে পরিচালনা করিতেন, বিপিন বাবু তাহার সংবাদ রাখেন কি? প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধীয় আইন, ইংরাজী দণ্ডবিধি, ইংরাজী ভাব ও সভ্যতা এবং বর্ণজ্ঞান প্রচার দ্বারা কি পরিমাণে সে অত্যাচার নিবারিত হইয়াছে, তাহা তিনি একবার নির্জ্জনে ভাবিয়া দেখিবেন। পূর্ব্ববঙ্গে স্বদেশী প্রচারের কৃতকার্য্যতার মূলে 'বুদ্ধিমান, শিক্ষিত ও জ্ঞানী' প্রজাদের স্বাধীন ইচ্ছা কি পরিমাণে ছিল, তাহা বিপিন বাবু কি ইতিমধ্যেই বিস্মৃত হইয়াছেন?

আমাদের কৃষকদিগের পূর্ব্বে বহুগুণ ছিল, বহু দোষও ছিল। সময়ের পরিবর্ত্তনে বহুদোষ অপনীত হইয়াছে, বহুগুণও অন্তর্হিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী হইতে হইলে, তাহাদিগকে অক্ষর জ্ঞান শিক্ষা করিতে হইবে। স্ত্রীশিক্ষার প্রতি পাল মহাশয় যে কটাক্ষ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধেও ঐ মন্তব্য প্রয়োজ্য। বর্ণশিক্ষা

প্রচলন করিয়া আদর্শ উন্নত কর, সমাজ উন্নত হইবে। আমাদের মাতৃস্থানীয়াদের আদর্শ উন্নত ছিল, পিতৃস্থানীয়দের সৎসঙ্গ ও উপদেশ অমূল্য ছিল, তাই বর্ণজ্ঞান-বিহীন হইলেও তাঁহাদের চরিত্র উন্নত ছিল। আর আমরা হীন, অস্থিরমতি, উচ্চাদর্শ-বর্জ্জিত, চরিত্র-শূন্য, বিলাসপঙ্কে আকণ্ঠমগ্ন, সুতরাং আমাদের কন্যাস্থানীয়ারা আদর্শাভাবে বর্ণজ্ঞান লাভ করিয়াও তাঁহাদের পিতামহীদের গৌরব ও সম্মান রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। ইহার জন্য কে দায়ী? বর্ণজ্ঞান শিক্ষা, না আমরা?

বিপিন বাবুর সাহিত্য সম্বন্ধীয় মন্তব্যের একটু আলোচনা করিলেই এ প্রবন্ধ শেষ হইবে। তিনি বলেন, পাশ্চাত্য-সাহিত্যের অধোগতি হইতেছে। আমরা তাহাতে দ্বিরুক্তি করি না। কিন্তু তিনি বিভীষিকা দেখিয়াও তাহার অনুকরণ করিবার অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারেন নাই। বাহুল্যভয়ে আমরা নমুনা উদ্ধৃত করিলাম না। কোন বাঙ্গালা-নবীশ পাঠকের নিকট তাঁহার শিক্ষাসম্বন্ধীয় প্রবন্ধ পাঠ করিলেই তিনি বুঝিতে পারিবেন, ভাষায় ও ভাবে কতদূর ইংরাজী অনুকরণ প্রবেশ করিয়াছে। ভাষার চটকে অনেক সময় ভাব ডুবিয়া যায়। এজন্য আজকাল অনেকের বিশ্বাস যে ভাষা সরল করিলেই বুঝি ভাবের পরিচয় দেওয়া হইল। আমরা আশা করি, ভাষা সম্বন্ধে বিপিন বাবুর মন্তব্য পড়িয়া কেহ এরূপ ধারণায় উপনীত হইবেন না।

আমরা বিপিন বাবুকে শ্রদ্ধা করি, তিনি সুবক্তা, বিদ্বান, চিন্তাশীল এবং পূর্ব্ব বঙ্গের গৌরব। তাঁহার শক্তির অপব্যবহার দেখিলে ক্ষোভের কারণ হয়। আমরা ভাবিতে পারি নাই, তিনি এরূপ প্রকাশ্যভাবে স্বদেশের কল্যাণকর উদ্যমের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবেন। তিনি ইচ্ছা পূর্ব্বক কুযুক্তির অবতারণা করিয়া ভারতবাসী জনসাধারণের অনিষ্টের চেষ্টা করিবেন, একথা আমরা বিশ্বাস করিতে পারিনা। কিন্তু মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ। (১)

শ্রীবসিকলাল রায়।

"বিথলঙ্গের আখড়ার" প্রতিবাদ।

১৩১৮ সালের চৈত্র সংখ্যায় শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার রায় M-A,B-L "বিথলঙ্গের আখড়া" ও তৎসহিত আখড়ার স্থাপয়িতা "রামকৃষ্ণ গোঁসাইর" ইতিহাস লিখিয়াছেন। তাহার উপসংহারে উক্ত লেখক উক্ত আখড়ার স্থাপয়িতা "রামকৃষ্ণ গোঁসাইর" সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীর "শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের" সঙ্গে তুলনা করিয়া, বিথলঙ্গের রামকৃষ্ণ গোঁসাইকেই অধিকতর যোগশক্তিসম্পন্ন বলিয়া লিখিয়াছেন। অধিকন্তু পশ্চিমবঙ্গের লোকের উপর সামান্য দোষারোপও করিয়াছেন।

এখন আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, বসন্ত বাবু কি প্রকারে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, বিথলঙ্গের "রামকৃষ্ণ গোঁসাই" দক্ষিণেশ্বরের "শ্রীশ্রীপরমহংসদেব" অপেক্ষা অধিকতর যোগশক্তি সম্পন্ন? বসন্ত বাবু উক্ত উভয় মহাপুরুষের সঙ্গে সহবাস করিয়া কি তাঁহাদের যোগশক্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন? আর উক্ত মহাপুরুষ-দ্বয়কে তুলনা করিয়া, কে

(১) এই প্রবন্ধ ছাপিতে দেওয়া হইলে চৈত্রের বঙ্গদর্শনে 'জবরদস্তি লেখা পড়া' প্রকাশিত হইয়াছে, দেখিলাম। র।

বেশী যোগ-শক্তি-সম্পন্ন, তাহা স্থির করিবার ক্ষমতা বসন্ত বাবুর আছে কিনা, তাহাও বুদ্ধিমান পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। তাঁহার এই অনধিকার-চর্চ্চা করা অসঙ্গত কি সুসঙ্গত, তাহাও সুধী পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। আমার বিশ্বাস, যদি বসন্ত বাবু একদিনও উক্ত মহাপুরুষদ্বয়ের কাহারও সঙ্গ লাভে সক্ষম হইতেন, তবে নিশ্চয়ই, বোধ হয়, এই দুই মহাপুরুষকে তুলে ওজন করিয়া দেখাইতেন না। মহাপুরুষের সঙ্গলাভে বসন্ত বাবুর এই ওজন করা বিদ্যা নিশ্চয়ই দূরীভূত হইত। দেখিলাম, বসন্ত বাবু এক জন M-A, B-L-উপাধিধারী লোক। কাজে কাজেই আজ কালকার মত মহা বিজ্ঞ লোক। অতএব তাঁহার নিকট হইতে নিশ্চয়ই আমরা ইহার যথার্থ সদুত্তর পাইতে ইচ্ছা করি। তিনি লিখিয়াছেন, ভিক্‌টোরিয়ার রাজত্ব প্রভাবে বড় বড় নব্য-শিক্ষিত লোক পাইয়াছিলেন বলিয়াই "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের" অত প্রভাব ও খ্যাতি। আর মুসলমান রাজত্ব কালে "রামকৃষ্ণ গোঁসাইর" সেই রূপ সুবিধা ছিল না বলিয়াই প্রভাব ও খ্যাতি কম। ইহা যে কিরূপ অসার কথা, তাহা পাঠকগণ অনায়াসে বুঝিতে পারেন। ইংরাজ রাজত্বে বড় বড় নব্য শিক্ষিত লোক পাইলে কিম্বা লোক শিষ্য হইলেই যে সিদ্ধ মহাপুরুষগণের প্রভাব ও খ্যাতি বিস্তৃতি লাভ করিবে, আর মুসলমান বাদসাহের রাজত্বে ইংরাজ রাজত্বের নব্য শিক্ষিত লোক পাইবার উপায় ছিল না বলিয়াই যে সিদ্ধ মহাপুরুষগণের প্রভাব ও খ্যাতি বিস্তৃতি লাভ করিবে না, ইহা একটা কোন কথাই নহে। ইহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। M-A, B-L-উপাধিধারী লোক যে এইরূপ কথা বলিতে পারে, ইহাই অত্যাশ্চর্য্য। মুসলমান-রাজত্ব-কালে বঙ্গদেশে ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যে সকল সিদ্ধ মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কথা কি পশ্চিমবঙ্গের লোকে কিম্বা অন্য প্রদেশস্থ লোকে জানে না? মুসলমান রাজত্ব কালে বঙ্গদেশে "রামপ্রসাদ", "সিদ্ধ সর্ব্বানন্দ", উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের "নানক", "কবীর", "দাদু"; বোম্বাই অঞ্চলের "তুকারাম" প্রভৃতি যে সকল সিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন, তাঁহাদের কথা কে না জানে? বসন্ত বাবুকে জিজ্ঞাসা করি, ইঁহাদের ভিক্‌টোরিয়ার রাজত্বের বড় বড় কত জন নব্য শিক্ষিত শিষ্য ছিল? তবে এই সকল সিদ্ধ মহাপুরুষদের কথা পশ্চিম বঙ্গের লোকে কিম্বা অন্য প্রদেশস্থ লোকে কিরূপে জানিতে পারিল? বসন্ত বাবু ইহার উত্তর কি দিবেন? তবে যে মহাপুরুষ যে প্রদেশে আবির্ভূত হন, সেই মহাপুরুষ সেই প্রদেশেই বেশী পরিচিত। আমাদের বাঙ্গালা দেশে, রামপ্রসাদ, সর্ব্বানন্দ, পরমহংসদেব, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, বাবাজীর ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সিদ্ধ মহাপুরুষগণ বাঙ্গালীর নিকট যেরূপ পরিচিত, বোম্বাই অঞ্চলে তুকারাম, পঞ্জাব অঞ্চলে সাধু হরিদাস ও নানক, পশ্চিমাঞ্চলে কবীর, তুলসীদাস প্রভৃতি সেই সেই প্রদেশের লোকের নিকট, সেইরূপ, পরিচিত। কারণ ইহা স্বাভাবিক কথা। যে যাহার কথা যত বেশী জানে ও যে যাহার যত নিকটে, সে-ই তাহার তত পরিচিত।

বোম্বাই, পঞ্জাব, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সিদ্ধ মহাপুরুষগণ বাঙ্গালীর নিকট বাঙ্গালী সিদ্ধ মহাপুরুষগণ হইতে কম পরিচিত বলিয়া কি আমরা তাঁহাদিগকে বাঙ্গালী-সিদ্ধ-মহাপুরুষগণ হইতে কম যোগশক্তি-সম্পন্ন বলিব? তাহা কখনও নহে। অধিক পরিচিত বাঙ্গালী সিদ্ধ মহাপুরুষগণ আমাদের নিকট যেরূপ ভক্তি, শ্রদ্ধা ও পূজার পাত্র, অন্য পরিচিত

অন্য প্রদেশস্থ সিদ্ধ মহাপুরুষগণও ঠিক সেইরূপ ভক্তি, শ্রদ্ধা ও পূজার পাত্র। মহাপুরুষদের বিষয় লইয়া এইরূপ তুলনা করা কিছুতেই সঙ্গত নহে। বসন্তবাবু কিরূপে এই তুলনা করিতে সাহসী হইলেন এবং কিরূপে তাঁহার মনে এই অবৈধ বিষয় উদয় হইল, তাহাই একটী অত্যাচার্য্য বিষয়। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এই বুঝিতে পারি যে, এইরূপ অবৈধ-তুলনার কথা মনেও স্থান না দিয়া, বৈষ্ণব পদকর্ত্তা পূজ্যপাদ নরোত্তম দাসের নিম্নলিখিত পদটী স্মরণ রাখাই উচিত ঃ—

"যে দেশে যে দেশে বৈসে গৌরাঙ্গের গণ।
ঊর্দ্ধবাহু করি বন্দ সভার শ্রীচরণ॥
হইয়াছেন হবেন প্রভুর যত দাস।
সবার চরণ বন্দ দন্তে করি ঘাস॥"

বসন্ত বাবু আরও লিখিয়াছেন যে, পশ্চিম-বঙ্গের লোক পরমহংসদেবকেই চিনেন। আর বিথলঙ্গের লোক গোঁসাইকে অনেকেই জানেন না। ইহাই বা কিরূপ ভিত্তিশূন্য কথা? বসন্ত বাবু একথা কিরূপে লিখিলেন? পশ্চিম বঙ্গের লোক বিথলঙ্গের গোঁসাইকে জানে কি না জানে, তাহাই বা তিনি কিরূপে বুঝিলেন? পশ্চিমবঙ্গের লোকের চিনা, অচিনার মধ্যে কি আছে? বিথলঙ্গের গোঁসাইকে পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা চিনে না বলিয়াই কি তিনি কম পরিচিত ও কম প্রভাবশালী হইবেন? পূর্ব্ববঙ্গের কি পশ্চিমবঙ্গের কিম্বা ভারতের অন্য কোন প্রদেশের কোন লোকেরই জানা কি না জানার, চিনা কি না চিনার, কিম্বা বাজারাণীর বাড়ীতে থাকা না থাকার উপর, সিদ্ধ মহাপুরুষের শক্তি কিম্বা যোগবল সিদ্ধান্ত হয় না। লোকে জানুক কি না জানুক, চিনুক কি না চিনুক, অর্থশালী লোকের আশ্রয়ে থাকুক আর নাই থাকুক, তাহাতে মহাপুরুষদিগের কিছুই আসে যায় না, কিম্বা তাঁহাদের প্রভাব-বিস্তার ঐ সকলের অপেক্ষাও রাখে না। মহাপুরুষদের প্রভাব শুক্ল প্রতিপদের চন্দ্রের ন্যায় বৃদ্ধি পাইয়া তুষাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় নিজেই প্রকাশ পায়। সিদ্ধ মহাপুরুষগণ সকলেই সমান ভক্তি শ্রদ্ধার পাত্র। বিথলঙ্গের "রামকৃষ্ণ গোঁসাই" যেরূপ ভক্তির পাত্র, দক্ষিণেশ্বরের "শ্রীশ্রীপরমহংসদেব"ও সেইরূপ ভক্তির পাত্র। মহাপুরুষদিগকে কম বেশী ভক্তি করা, কিম্বা তাঁহাদিগকে তুলনা করিয়া কম বেশী যোগশক্তি-সম্পন্ন বলিয়া প্রকাশ করা নিতান্তই ধৃষ্টতা, মূর্খতা, ও মহাপাপের পরিচয়। নব্য-শিক্ষিত লোকের মধ্যে যে এইরূপ লোক থাকিবে, ইহা বেশী আশ্চর্য্যের কথা নহে। তবে আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা এই যেঃ—

"নীচ যদি উচ্চ ভাষে।
সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে॥"

বৈষ্ণব মহাজনের এই উপদেশ।

শ্রীমুকুন্দলাল বসু।

চেন্নপট্টন। (২)

ব্রাহ্মণের অবস্থা সুখদ। রাজ-দত্ত ভূমীর কর গ্রহণ, অপরের সাহায্যে কৃষি বা বিদ্যাবত্তা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। তাঁহাদের ব্রহ্মস্বকে "শ্রোত্রিয়ন্দার" বলে। এবম্বিধ উপায় না থাকিলে, তীর্থ যাত্রা করিতে হয়। নাটকোট-নিবাসী চেট্টি সমাজ,

দূরগামী পথে ত্রিরা পঞ্চক্রোশ অন্তর ধর্ম্মশালা করিয়া দিয়াছেন। তথায় যাত্রিত্রয়ের জন্য বাস ও ভোজন প্রাপ্য। এইরূপে ষন্মাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, পুনরপি পথান্তরে নিষ্ক্রমণ করিয়া দেবদর্শন ছলে, বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত করিতে পারেন। ভারতের তমসাচ্ছন্ন বিভাগের, এই আর একটী বিশেষত্ব।

ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম, এক্ষণে কোন জাতিতে নাই। তাঁহাদের আচার ব্যবহার থাকিতে পারে। অন্ধ্র, দ্রাবিড়, কর্ণাটে, বিজয়নগর সম্রাটের আধিপত্য স্বীকার করতঃ কোন যোদ্ধা ও মেধাবী ব্যক্তি, বিভিন্ন প্রদেশে সংস্থানিক হইতেন। সে বিষয়ে বর্ণভেদ গ্রাহ্য হইত না। তিনি কর সংগ্রহ করিয়া কিয়দংশ স্বয়ং, তথা সেনা পালন ব্যয় গ্রহণ করিতেন। লোক যাত্রা বিধান, তাঁহারি হস্তে থাকিত। ইহারাই, পলিগার নামে প্রথিত। ক্রমে এই ক্ষমতা উত্তরাধিকারীর হস্তগত হইতে আরম্ভ হইলে, তাহারই ভূম্যধিকারী হইল। দেশ রক্ষার্থ পলিগারগণ স্বশস্ত্র সেনা রাখিলেও, প্রজাকে আত্ম রক্ষার জন্য অস্ত্র ব্যবহার করিতে হইত। করগ্রহণে নির্দ্দিষ্ট নিয়ম থাকে নাই। মহিসুর রাজ, যৎকালে ৩২ খানি গ্রামের অধিপতি ছিলেন, তখন তিনি পলিগার। ইহারা লৌহময় কবচ ধারণ করিয়া, পঁক্তিতে কেহ অসি চর্ম্ম বন্দুক, ধনুর্ব্বাণ, শেল বা কুঠার লইয়া যুদ্ধ করিত। পরন্তু খড়্গ পরিত্যাগ করা নিষিদ্ধ। দুইদিকে ধার ঋজু তরবার, তাহাদের প্রিয়বস্তু। ভাট্-কবি চন্দবর্দ্দাই, রাজপুত যোদ্ধৃগণের যে সজ্জা বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা তদনুরূপ। ক্ষত্রিয়ের বর্ম্মা উপাধির উক্ত লৌহ-শৃঙ্খল-নির্ম্মিত কবচ হইতে হইবে। শিখেরাও বর্ম্মা ধারণ করিয়াছেন। তাঁহারা কহেন, যোদ্ধার খড়্গ প্রধান অস্ত্র। গুলি দ্বারা প্রহার, উপাংশু বধের মত। উহাতে বীরত্বের লেশ নাই। এখন সে কাল গিয়াছে। বীরগণ যেমন দুর্দ্ধর্ষ, তেমনি সরল। নোবেল সাহেব, "নাইট্রোগ্লিসিরীন" সহ শোষক পদার্থ যোগ করিয়া "ডিনামাইট" উদ্ভাবন করিয়াছেন। তিনি রণবিদ্যায় প্রযুজ্য, ধূমরহিত ঔর্ব্বাস্ত্র প্রভৃতির ১২৫ প্রকারের অস্ত্র কেবল ইংলণ্ডে প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তদ্দ্বারায় উপার্জ্জিত অর্থের কিয়দংশ, শান্তি সংস্থাপন কল্পে দান করেন। হায়দার আলি-তাড়িত পলিগারদিগকে কর্ণওয়ালীস মহোদয় তাহাদের দুর্গ প্রভৃতিতে পুনঃস্থাপন করিয়াছিলেন। পরে উহারা হৃদ্যতা ত্যাগ করিয়া টীপুর সহিত মিলিত হইয়াছিল। অজ্জন্য স্বাধীনতা হারায়।

হিন্দীতে যে অর্থে শেট, চেট্টি সেই পর্য্যায় ভুক্ত। শ্রেষ্ঠী ইহার সংস্কৃত রূপ। বৈশ্য শূদ্র নির্ব্বাশেষে ব্যবহৃত হয়। কোমটিগণ বৈশ্য। তাঁহারা কামাক্ষীর উপাসক। ভিন্ন দেশীয় স্বজাতিয়ের সহিত, আহার বা বিবাহ দিতে অপরাঙ্মুখ। তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলি গুপ্ত প্রথা আছে, সেই ভেদ জ্ঞাত হইয়া কার্য্য করেন। কৃষি বা শিল্প নিষিদ্ধ। বণিক পথ অবলম্বনীয়। চেট্টি, আর্য্য শব্দ নহে। সংস্কৃত চেট অর্থে দাস। দ্রাবিড়, "সট্টি" বলিতে অন্নপাত্র বুঝায়। উহার রূঢি করিয়া চেট্টি দ্রব্য মাত্রের ব্যবসায়ী বাচক হইয়াছে। এতন্নগরের ধনীদিগের অধিকাংশ, এই শ্রেণীভুক্ত। রাজপথে "অফীস" নাকাড়, বিশেষ প্রকারের উচ্চঃ শ্বেত উষ্ণীস ধৃত, কৃষ্ণকান্ত মুখ অনেক বার দেখিয়াছি। শূদ্র চেট্টিরা সংখ্যায় ৩ লক্ষ। সেতু-বন্ধের নিকট-

বর্ত্তী নাটকোটবাসী শ্রেষ্ঠী শিখা ও কেশ মুণ্ডিত। পাদুকা অঙ্গবক্ষা-বর্জ্জিত। ভস্ম-লিপ্ত কালশ্রীতে, অনার্য্য ভাব দূর হয় নাই। যেখানে ব্যবসায়, সেই খানেই এই শিব-ভক্ত তামিল জাতি কোন বাধায় ভ্রুক্ষেপ করে না। কলিকাতায় মাড়বারিদের নিকট কেবল ঋণ গ্রহণার্থ, তাঁহাদের অসম্মান আছে। শেঠীরা, কদাপি যোত্রহীন হয় নাই, এই আস্থার জন্য, কোটী মুদ্রার হুণ্ডি ক্রয় বিক্রয় চলে। তদর্থ স্বর্ণ, ভৌমিক বেঙ্গুন প্রেরিত হয়। পার্শ্বনাথের অভিযানের ন্যায় আড়ম্বর সহ দ্রাবিড়-রজত-নির্ম্মিত "কোইল" তামিল প্রণালীতে শোভা যাত্রা করিয়া,এক্ষণে প্রতি বৎসর কলিকাতায় বহির্গত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সেই সমতল ছত্র, সেই আড়ানি, সেই গ্রাম্য আনন্দ যন্ত্র মাদলের সহিত কাহাল জাতীয় বহির্দ্ধারিক তীব্র বৌসন চৌবী, ৪+৫ স্বর উর্দ্ধে নিনাদিত। বোধ হয় যেন, চীনা পাটনে উৎসব দেখিতেছি।

তত্রত্য কৃষক, দৈব ও রাজকীয় আধি দ্বারা সদাপীড়িত। পার্ব্বত্য ভূমি, সদা শস্য উৎপাদনের অনুপযোগী থাকে। ক্ষেত্র সিঞ্চনের জন্য নদীর জল মিলা, বৃষ্টির উপর নির্ভর করে।

মদ্রাস, কলিকাতা ও মুম্বই অপেক্ষা বিষুবরেখার নিকটবর্ত্তী। এখানে গ্রীষ্ম অধিক হইবার কথা। কিন্তু, মহাসত্ত্ব বসুধি উত্তপ্ত হইতে না পারায়, তৎসংশ্লিষ্ট বায়ু দিবা ভাগে নিয়ত ভূমির দিকে প্রবাহিত হইয়া তাপ হরণ করে। কলিকাতায় তাপমান উর্দ্ধসংখ্যায় ৮৫, মুম্বই ৮০ অংশ, মদ্রাসে ৭৯, কিন্তু ৯০ পর্য্যন্ত হইতে পারে। এখানে উষ্ণতার পরিমাণ, বর্ষে বর্ষে, অধিক কি, প্রতি-মাসে পরিবর্ত্তিত হয়, ঠিক করা যায় না। কোন সময়, পৌষে এমন দাঁড়ায়, তাপাধিক্য বশতঃ অপরাহ্ণ-কৃত্য পূর্ব্বাহ্নে অনুষ্ঠেয়। ঘোড়দৌড় বৈকালে হইতে পারে না। রাত্রে বহির্দ্দেশে শৈত্য দ্বারা আক্রান্ত হইবার ভয় নাই। আমরা এ প্রকার স্থানকে, চির-বসন্তের আকর বলি। ইউরোপীয়দের পক্ষে, ইহা অবচ্ছেদে নবচ্ছেদে গ্রীষ্ম। মুম্বইবৎ চেন্নপট্টনে, যান্মাসিক নৈঋতি ও ঈশান কোণ হইতে প্রকাহিত পবন যথাক্রমে ক্রিয়াশীল। পশ্চিম ঘাট শ্রেণী, বারিদাগমনে প্রতিকূলাচরণ করিয়া থাকে।

কৃষি ক্ষেত্রের অর্দ্ধাংশের অধিক রায়ত-আরি। পাদাংসা, জমিদারী ও কিঞ্চিৎ ইনাম-ভূমি। ইনাম ভূমির কর, অতি মাত্র অল্প। জমিদারী বিভাগে, গবর্ণমেণ্ট প্রজার সহিত নির্দ্ধারণ না করিয়া, ভূম্যধিকারীর সহিত ৩০ বৎসর অন্তর কর ধার্য্য করেন। জমিদারী প্রজার, বিশেষ কোন সত্ব নাই। ভারতেশ্বরীর রায়ত-আরি প্রজার পক্ষেও ৩০ বৎসর অন্তর কর ধার্য্য হইবে। অনাবৃষ্টি অতি বৃষ্টির জন্য, পাদ অংশ ত্যাগ করিয়া, কর্ষণ ব্যয় ব্যবকলন করতঃ যে প্রকার শস্যের মূল্য স্থির হইবে, রাজস্বরূপে তদর্দ্ধ গৃহীত হইয়া থাকে। ভূমির মূল্য জল সিঞ্চিত হইলে প্রতি বিঘা ৫০৲ টাকা, তদন্যথায় ১০৲ টাকা। নির্দ্ধারণ কালে ভূমির যে প্রকার অবস্থা থাকে, তদনুসারে ত্রিংশৎ বৎসর কর-ভার বহনীয়। কৃষক যদি তৎকালে, আপন ক্ষমতায় উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিয়া থাকে, উহাকে উচ্চহারের শ্রেণীতে নিবদ্ধ করিয়া দণ্ডিত করা হয়। এ অবস্থায়, দুর্ভিক্ষ অনিবার্য্য। গত ৬০ বৎসরের মধ্যে, ৬ বার অন্নান্ন-কাল গিয়াছে।

বাঙ্গালা অপেক্ষা, এখানে কর অধিক।

মধ্যপ্রদেশে তদপেক্ষা গুরুতর। তথায় যত দুর্ভিক্ষ হইয়া থাকে, ভারতের অন্যত্র তদ্রূপ নহে। বঙ্গের কোথাও খাজনা উৎপন্ন দ্রব্যের ষষ্ঠাংশের অধিক নহে। পূর্ব্বাঞ্চলে, তদপেক্ষা ন্যূন। মধ্যভারতে, অবান্তর শুল্ক সহ প্রতি শতে ৭২৲ টাকা রাজস্ব সংগৃহীত হয়। প্রজার ঋণ ও দুরবস্থার প্রকৃত কারণ, রাজস্ব দিয়া, সুভিক্ষের কালেও, কৃষিজীবিগণ সঞ্চয় করিতে অক্ষম। আমাদের শাস্ত্রে ষষ্ঠাংশ কর গ্রহণের বিধান আছে। বৃটীস রাজ বঙ্গে যাহা করিয়াছেন, যদি গ্রাহ্য করেন, মদ্রাস ও অপর স্থান মহোপকৃত হইবে। বঙ্গে পূর্ব্বে দুর্ভিক্ষ হইত, স্থায়ী কর নির্দ্ধারণান্তে, উহা ভীষণ ভাব ধারণ করিতে পারে নাই। এখানে আর কর বৃদ্ধি হইবে না, গবর্ণমেণ্ট একবার প্রতিশ্রুত হন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, তদ্রূপ কার্য্য হয় নাই।

ডাক্তার বুচানন লিখিয়াছেন, প্রজাকুল কহিয়া থাকে, বিজয়নগরাধীশ কৃষ্ণরায়ের সময়, তাহারা অতিসুখে অতিবাহিত করিত। টিপুশূলতান পর্য্যন্ত সে নিয়ম লঙ্ঘন করেন নাই। পল্লিসমাজ, লোক যাত্রা নির্দ্ধারণ করিতেন। "তালুক"গুলি বহু "হাবেলিতে" বিভক্ত ছিল। এক সহস্র বরাহ মুদ্রা (কিঞ্চিদধিক ৩ টাকায় এক বরাহ) কর সংগৃহীত হয়, এমন ভূভাগ লইয়া, প্রত্যেক তহসিলদারের অধীনে, এক তালুক গঠিত হইয়াছিল। তিনি ব্রাহ্মণ হইতেন। অধীনস্থ হাবেলিতে একজন শাস্তা নিযুক্ত হইত। তিনি রাজকর্ম্মচারী, আমীলদার নামে খ্যাত। সিকদার, অধিকাংশ স্থলের ব্রাহ্মণ। তিনি গ্রামের ৪ জন বর্ষীয়ানের পরামর্শের সহিত, ক্ষেত্র ও সরোবর সম্বন্ধে, নিম্ন-কর্ম্মচারীর অসীমাংসিত বিষয় নিষ্পত্তি করিতেন। আমীলদারের সম্মতি ভিন্ন, দণ্ডবিধান হইত না। শাস্তি লঘু ভাবের ছিল। প্রধান প্রজা ও কৃষিজীবী ব্যক্তি পটেল হইতেন। তিনি শূদ্র। তিনিই মুখ্য। করসংগ্রহ এবং জাতীয় দলপতির ন্যায় তাবৎ বিবাদভঞ্জন তাহার কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে, সেও ৪ জন গ্রাম্য-বৃদ্ধের দ্বারা চালিত। তাঁহারা নিষ্পত্তি না হইলে, ব্রাহ্মণ সেরেস্তাদার কর্ত্তৃক বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়া, আমীলদারের গোচরার্থ প্রেরিতব্য। অর্থাভাব থাকিলে, পটেল প্রজাকে ঋণ দিবে। তদ্ধেতুক উৎপন্ন শস্যের একাংশ, বৃদ্ধিরূপে তাঁহার প্রাপ্য। এইরূপ আনুগত্য পরম্পরায় কেহ আপন ক্ষমতার অসংব্যবহার করিতে পারে নাই। পটেল, সেরেস্তাদার ও চৌকিদারের পদ পুরুষানুক্রমিক। কেহ অধিক কর সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিলে, আমীলদার কর্ত্তৃক পটেল পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। কৃষ্ণ রায়ালুর রাজত্বে, সিঞ্চনবিহীন ভূমির যে কর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহা মুসলমান অধিকারে বৃদ্ধি হইতে পারে নাই। প্রজা পাট্টা পাইত না বটে, কিন্তু যতদিন নির্দ্দিষ্ট কর প্রদান করিবে, কেহ তাহাকে উচ্ছেদ করিতে সমর্থ নহে। কৃষক অক্ষম হইলে, আমীলদার "তকাবি" দিবেন, বা কৃষিকার্য্য হইতে নিষ্কৃতি দিতে পারেন। গ্রাম্য-ভৃত্য, চতুর্ব্বিধ। প্রথম শস্য-প্রহরী, পত্র বা সংবাদ বহন, পথপ্রদর্শন ও ক্ষেত্রের সীমা পর্য্যবেক্ষণ-কারক। দ্বিতীয় ব্যক্তি, খাল ও সঞ্চিত বৃষ্টিজলপূর্ণ সরোবর-বারিপ্রদানকারী। তৃতীয়, কৃষক যাহাতে অপরবৃত্তি অবলম্বন করিতে না পারেন, তজ্জন্য সতর্ক রহে। চতুর্থ, পরিমিতিকারক। হাবেলির বেতনভুক কর্ম্মচারীগণ, প্রতি মাসে প্রাপ্য পাইয়াছেন।

ইংরাজ, যদি পল্লি-সমাজের অনুকরণে

"মিউনিসিপালিটি" করিতেন, অতি সুখের হইত। গ্রাম্য-সমিতি, পূর্ব্বকালে, সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে শস্য আহরণ করিয়া ধর্ম্মগোলা করিয়া রাখিত। দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, বিতরণ করিবার নিয়ম। পাশ্চাত্য অর্থ-নীতি, সমৃদ্ধ দেশে ব্যবহৃত হইবার যোগ্য। শিল্পকলা-হীন নির্ধন-স্থানে, স্বাধীন বাণিজ্য উপযুক্ত নহে। লৌহপথ বিস্তৃত থাকায়, অধিক মূল্যে শস্য বিক্রয়করতঃ, কৃষিজীবী-লব্ধ অর্থ বিলাসিতায় ব্যয় করিয়া ফেলে। প্রয়োজনের মুহূর্ত্তে টাকা বা শস্য, কোন প্রকার ধন অবশিষ্ট রহে না। কিঞ্চিৎ অর্থ থাকিলেও যে মূল্যে বিক্রয় করিয়াছে, ক্রয় মূল্য তাহার তুলনায় অত্যধিক।

গত দুর্ভিক্ষে, তণ্ডুল টাকায় ২॥ হইয়াছিল। প্রত্যহ ।০ আনার ন্যূন ব্যয়ে, কেহ উদরপূর্ত্তি করিতে পারে নাই। বৃটীসরাজ, উপসমনশিবিরে যাইতে সমর্থদিগকে, দেড় আনা মাত্র দিতে সমর্থ হন। পাঁচ কোটীর মধ্যে, সার্দ্ধ দ্বাদশ লক্ষ লোক, দুর্ভিক্ষের সাক্ষাৎ বা পরম্পরা কারণে গতাসু হইল। বঙ্গালীগণের অনেকে তৎকালে উপন্যাসের মত নির্লিপ্ত ভাবে, এই শোচনীয় ঘটনা সংবাদ পত্রে পাঠকরা ভিন্ন ভিক্ষা দিয়া সাহায্য করিতে পারেন নাই। অর্থ দুর্ভিক্ষের জন্য। কল্যাণী বৃটন রাজলক্ষ্মী, প্রসন্ন প্রজার হৃদয়-শতদলে দাঁড়াইয়া আনন্দ-সুধা বর্ষণ করুন। গবর্ণমেণ্ট কর-ভার হ্রাস করিয়া দিন।

শ্রীরঙ্গের বৈকুণ্ঠ উৎসব সন্দর্শন, এখানে সমাপন করিব। চেন্নপট্টনের দেবালয়স্থ সকল বিগ্রহগুলী, আদ্রার দিন পূর্ব্বাহ্ণে, নগর পরিক্রমণার্থ বহির্গত হইয়াছে। অভিযানের অগ্রে পথ-বোধক পট। মাদলের অনুবর্ত্তী হইয়া সানাই বাজিতেছে। এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে, চন্দ্রমল্লিকা-দামে সমাচ্ছন্ন বিমানগুলী, বাহক স্কন্ধে সুস্থির হইল। পুষ্পাভরণের মধ্যে, মণিমুক্তা-খচিত দেবঅঙ্গের কিঞ্চিৎ ভাগ, ও বক্ষ-বিলম্বিত হারের কেবল মাত্র বৃহৎ দোলকখানি প্রতিভাত হইয়াছে। শাড়ীর নিম্নে পীত বর্ণের পায়জামা পরিহিতা, "কঞ্চনী" বা হস্ত ভঙ্গি সহকারে নৃত্য গীত আরম্ভ করিল। শ্রুতিমধুর, অচল, বিশ্রান্ত, নিদ্রা আকর্ষণ বা বৈতালিকবৎ মৃদু ভাবে উদ্‌বোধনে সক্ষম। যড়জের সহিত, ক্ষণে, ক্ষণে ধৈবৎ আসিয়া মিলিতেছে। উহা ক্রন্দন ও শোক-সূচক বটে, কিন্তু আমাদের কীর্ত্তন অঙ্গের মত নহে। বাঙ্গালা সুর, নিরাশ বা ভয়-ব্যঞ্জক মধ্যম কার্য্য করে। "কঞ্চনী" ধীর শান্তিপ্রদ পাদবিক্ষেপ কালে গান্ধার উঠিতেছিল। আশ্বাস উৎসাহপ্রদ, ঋষভ আলাপ করা এক্ষেত্রে অসম্ভব। সুতরাং তীব্র নিষাদের পরিষ্কার পঞ্চম প্রকাশ করিবার অবসরাভাব। এই দেব-বেশ্যাগণ, যাতে সামাজিক ও পারমার্থিক উৎসবে উপস্থিত হইতে না পারে, তজ্জন্য সমাজ-সংস্কারকেরা সচেষ্ট হইয়াছেন। মহারাষ্ট্রের মত দ্রাবীড় তন্তুবায়, দেবসেবার কথা সমর্থন করে। ইউরোপে, পূর্ব্বে এই প্রথা ছিল।

বাবু কেশবচন্দ্র সেন-সংস্থাপিত, দক্ষিণ ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজের সংকীর্ত্তক-মণ্ডলী, তামীল অক্ষর-যুক্ত পতাকা ও গীতি পুস্তিকা হস্তে, ইংরাজী বহির্ব্বাদক সম্প্রদায়কে সম্মুখীন করতঃ, পুর-পর্য্যটক প্রতিমা গুলীর পশ্চাৎবর্ত্তী হইলেন। বালক ও বয়স্কেরা, তানপুরা সহযোগে গাহিতেছেন। অনতিদূরে উদাত্ত, অনুদাত্ত ও সংবিৎ-স্বরে, স্বাধ্যায় হইতেছে। মানব স্তম্ভপায়ী, কিন্তু এই দলের কেহ কেহ, গোদুগ্ধ পানে ক্ষান্ত।

নারিকেল-নিষ্পীড়িত দুগ্ধ সেবন করেন। আমরা দুগ্ধকে নিরামিষ জ্ঞান করি। ইউরোপে, ডিম্ব আমিষ মধ্যে গণ্য নহে। এদেশে, সনাতনী নামে চৈতন্য সম্প্রদায় আছে। তাঁহারা ভজন কালে, মাঙ্গল্য খোল করতাল ব্যবহার করেন কি না, জ্ঞাত নহি। অধুনা নূতন কেহ ব্রাহ্ম হইতেছেন না। তত্ত্বসভা, আর্য্যসমাজ, রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়, বাধা-স্বামীর দল, এখন লোকের আধ্যাত্মিক ক্ষুধা শান্ত করিতেছেন। হিন্দুত্ব অতি কঠিন, চাপিলে আয়তন হ্রাস হয়। মোচড়াইলে, আকৃতি বদ্‌লায়। উভয়ই, আয়াস-সাধ্য। এই স্থিতি-স্থাপকতার গুণে, তাহা প্রশস্ত হইতেছে। যাহাতে বস্তু অধিক, তাহা অধিক প্রয়াস না করিলে বিচলিত হয় না।

পাচৈ অপ্পা নামক চেট্টি ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে সকীয় ধনরাশি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কল্পে দান করিয়া গিয়াছেন। তৎসংলগ্ন বিস্তীর্ণ গৃহ, সার্ব্বজনিক সভা মণ্ডপরূপে ব্যবহৃত হয়। ভিত্তি-সংলগ্ন দুই খানি তৈলবর্ণক চিত্র দেখিলাম। অপ্পা, কোন ছাত্রকে মস্তকে হস্তার্পণ করতঃ অভয় দিতেছেন। তাহার শিক্ষার ব্যয়ের জন্য তিনি দায়ী রহিলেন। সে শত মুখে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে। উভয়ের পশ্চাতে, "কোইল" দৃশ্যমান। তাহার অর্থ, কাঞ্চি ও চিদম্বরে দেবসেবার্থ তাঁহার দান স্মরণীয়। উক্ত স্মৃতি জাগ্রত রাখিবার জন্য, এই বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ও বর্ত্তমান ছাত্রবৃন্দ সমবেত হইয়াছেন। তন্মধ্যে, রায় বাহাদুর পঃ বঙ্গনাথ মুদেলী সভাপতি হন। অনারেবল সর টঃ মথু স্বামী আইয়া, দেওয়ান শেষিয়াই শাস্ত্রী, ডাক্তার ডঙ্কন লভেরী, পঃ শ্যামসুন্দর চেট্টি, উইলীয়ম ডিগ্‌বী, মহামহোপাধ্যায় অপর্ট প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। ইহার পক্ষান্তে, হিন্দু নামক প্রাত্যহিক ইংরাজী পত্র পাঠে জ্ঞাত হইয়া, তত্ত্বসভার সপ্তদশ বার্ষিক অধিবেশন দর্শন মানসে, এস্থলে আমরা পুনরাগমন করি। শ্রীদুর্গাচরণ ভট্টি।

৺হরকুমার কাব্যতীর্থ সিদ্ধান্তভূষণ।

অনেক দিন হইতে ভাবিতেছিলাম যে, স্বর্গীয় দ্বিতীয় পণ্ডিত মহাশয়ের জীবনের দুই চারিটী কথা লিখিয়া কোন পত্রিকায় দিব। কিন্তু সাহস হইতেছিল না, এই জন্য যে ৺হরকুমার দেশের বড় লোক শ্রেণীর কেহ ছিলেন না। গরীব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের একটা জীবনই বা কি, আর তার ইতিহাসই বা কি। তথাপি মনে মধ্যে মধ্যে কেন একটা উদ্বেগ অনুভব করিতেছিলাম। পণ্ডিত মহাশয় সুশীল বালক এবং যুবকরূপে বিক্রমপুরে বিশিষ্ট অধ্যাপকের নিকট ব্যাকরণ স্মৃতি এবং কাব্য পাঠ করেন। সংস্কৃতে তাঁহার কতদূর পাণ্ডিত্য ছিল, তাহার পরিমাণ করা আমাদের সাধ্যাতীত, তবে ইউনিভার্সিটীর কৃতীছাত্র স্থানীয় মুনসেফ বাবু বাইমোহন কর্ম্মকার এম-এ,বি-এল কে পণ্ডিত মহাশয়ের ভূয়সী প্রশংসা করিতে শুনিয়াছি। আমাদের একজন সহযোগীকে তিনি বি-এ পরীক্ষার অনার কোর্শ পড়াইতেন। সহযোগী বলিতেন যে, অধীত

* ইনি ময়মনসিংহ কিশোরগঞ্জের বারইগ্রামে ভট্টাচার্য্য-পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন।

বিদ্যায় পণ্ডিত মহাশয়ের অসাধারণ অধিকার ছিল।

কি শকুন্তলা, কি উত্তরচরিত, কি দশকুমারচরিত, কি শিশুপালবধ, কি মালতী-মাধব, যে কোনও গ্রন্থের দুই এক ছত্র বলিয়া দিলেই পণ্ডিত মহাশয় আবৃত্তি আরম্ভ করিতেন। নেবুকোণায় তাঁহার 'রাসা' ছিল। নিজের টোল ছিল। ভৃত্য নাই—পণ্ডিত মহাশয় নিজেই গৃহকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। এ দিকে ছাত্রদিগকেও পাঠ দিতেছেন। স্কুলের সময় হইয়াছে, এমন সময় স্মতির ব্যবস্থা নিতে লোক আসিয়াছে, তিনি তৈল মাখিতে মাখিতে ব্যবস্থা আওড়াইতেছেন। আলস্য কাহাকে বলে, তাহা তিনি জানিতেন না। মধ্য বয়সে বিভাগীয় ইনস্পেক্টর মিঃ ষ্টেপেলটানের আদেশে তিনি ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করেন। আমরা সর্ব্বদাই তাঁহার হাতে একখানা King Reader অথবা T.C Pal's Grammar দেখিতাম। তিনিও সুযোগ পাইলেই হাসিতে হাসিতে আমাদিগকে তাড়া করিয়া আসিতেন। অনেক কথা তিনি ছাত্রদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া লইতেন। এইরূপ উৎসাহ দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইতাম।

পদের বেতন ছিল মোটে ২৪ টাকা। ইহাতেই তিনি "Passing rich" ছিলেন। গাভী ও বৎসের সেবা নিজেই করিতেন। মধ্যে মধ্যে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়াও কিছু আয় করিতেন। পরিবারের মধ্যে স্ত্রী, এবং ছেলে মেয়েতে ৪।৫ জন। এই স্বল্প আয়ে তিনি কিরূপে চালাইতেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতাম না। তিনি সর্ব্বদাই প্রফুল্ল থাকিতেন। অভাব সৃষ্টি করিতেও তিনি জানিতেন না, অভাবজনিত দুঃখেও কখনও বিমর্ষ হন নাই। দৈনন্দিন কার্য্যের মধ্যে সন্ধ্যা, পূজা, টোল ও স্কুলের ছাত্র পড়ান, আর নিজের অধ্যয়ন এবং গৃহকার্য্য দেখা। তাশ পাশা প্রভৃতি ক্রীড়া জানিতেন না, ভাবভঙ্গী সহকারে under toneয়েও তাহাকে কখনও পরনিন্দা করিতে শুনি নাই। এইরূপে, নেবুকোণায় তিনি অষ্টাদশ বৎসর অতিবাহিত করেন। মৃত্যুর বৎসরেও তাঁহাকে কাশীধাম যাইয়া বেদাধ্যয়ন করিতে বলায়, তিনি হাস্য-মুখে স্বীকৃত হইয়া বলেন, আমাকে মাসে কুড়িটী টাকার যোগাড় করিয়া দিন্। কিন্তু তাহা হইয়া উঠে নাই। 'লোকে বলে, থাকতে কাস্তে, হারা'লে না'। পণ্ডিত মহাশয়কেও আমরা থাকিতে চিনিতে পারি নাই। মৃত্যু-কালে তিনি যে অবস্থার মধ্যে এই পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাবিবার বিষয় এবং তাহা যে দেখিয়াছেন, তিনি কখনও ভুলিতে পারিবেন না।

একদিন নিদ্রোত্থিত হইয়া শুনিলাম, পণ্ডিত মহাশয়ের ভারি অসুখ। রাত্রি ১২টার পর দুইজন ডাক্তার ডাকা হইয়াছিল। তখনই যাইয়া দেখিলাম, তিনি শয়ান আছেন, পত্নী কাছে বসিয়া সেবা করিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, 'বড় কষ্ট হইতেছে।' ৩।৪ দিন পূর্ব্বে গাভীর সেবা করিবার সময় গাভীটী তাঁহার তলপেটে ঢুষ মারে। সেইদিন স্কুলে গেলে তাঁহার মুখ মলিন দেখিয়া হেডমাষ্টার মহাশয় কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তিনি তখন নিজেও বিশেষ কিছু বুঝিতে পারেন নাই।

অদ্য স্কুলে যাইবার সময়ও তাঁহাকে তেমন খারাপ অবস্থায় দেখিয়া যাই নাই। স্কুলে যাইয়া একটুক্ষণ পরেই 'শুনিলাম, পণ্ডিত মহাশয়ের অবস্থা ভাল নহে।' তখনই সহদয়

হেড্ মাষ্টার মহাশয় ক্লাশে ক্লাশে যাইয়া ছাত্রদিগকে বলিতে লাগিলেন "তোমাদের পণ্ডিত মহাশয় কাতর। যে যাহা সাহায্য করিতে চাও, আগামী কল্যই নিয়া আসিবে।" পর-দিনই ছয় শতাধিক ছাত্র মিলিয়া প্রায় দেড় শত টাকা সংগ্রহ করিল। ময়মনসিংহ সহর ২৫ মাইল দূর। তথা হইতে একজন দক্ষ অস্ত্র-চিকিৎসক আনা পরামর্শ হইলে টেলিগ্রাম করা হইল। অপরাহ্নে পণ্ডিত মহাশয়ের বাসা লোকে লোকারণ্য হইল। স্থানীয় হাকিম, উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, শিক্ষক, সকলেই পণ্ডিতমহাশয়কে দেখিতে আসিয়াছেন। চিকিৎসকগণ call না পাইয়াও স্বেচ্ছায় রোগী দেখিতে আসিয়াছেন। ছাত্রদিগের উৎসাহ অপরিমীম। ৪।৫ জনে অনবরত বাতাস দিতেছে, কেহ ঔষধালয়ে ছুটিতেছে, কেহ সংবাদ বহন করিতেছে। ময়মনসিংহ হইতে ডাক্তার আসিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া বাইসিকেলের ডাক বসান হইল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে সংবাদ আসিল, ডাক্তার আসিয়াছেন, তিনি গোদারা পার হইতেছেন। ১৫।২০ মিনিট পরে ডাক্তার যামিনীমোহন দাস, এম্-বি, প্রায় দুই শত ছাত্রপরিবেষ্টিত হইয়া পণ্ডিত মহাশয়ের বাসায় উপস্থিত হইলেন। তখনই রোগী দেখান হইল। দেখিয়া ডাক্তার শিহরিয়া উঠিলেন। রোগ Strangulated Hernia. পরদিন হাঁসপাতালে অপারেশন হইবে, স্থির হইল। রাত্রিতে ছেলেরাই সব করিল। বোধ হয়, যে বাড়ীতে বিবাহ হয়, সেই বাড়ীতেও সর্ব্বদা এত লোক দেখা যায় না। রাত্রি প্রভাত হইলে একখানা ইজিচেয়ারে শয়ন করাইয়া ছাত্রগণ তাঁহাকে বহন করিয়া লইয়া চলিল। পথে ৪।৫ জন পাখা হাতে বাতাস দিতে লাগিল। 'operation হইয়া গেল, ডাক্তার মহাশয়কে যাইয়া জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়া উঠিলেন "O, he is a dead man" রোগীর ঘরে আসিয়া দেখিলাম, পণ্ডিত মহাশয়ের সেই মূর্ত্তি আর নাই। মর্ম্মন্তুদ-যন্ত্রণায় অনবরত ছট্‌ফট্ করিতেছেন। ছাত্রগণ প্রাণপণে সেবা করিতেছেন। কিন্তু যন্ত্রণা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। অপরাহ্নে পুনরায় ছাত্রগণ তাঁহাকে লৌহখট্টায় শয়ন করাইয়া আপনারা সেই খট্টা কাঁধে করিয়া তাঁহাকে বাসায় লইয়া চলিল। তিনি আকাশের দিকে চাহিয়া দুই হাতের 'কর' ধরিয়া ইষ্টমন্ত্র জপিতেছেন। রাজপথে যাঁহারা গমনাগমন করিতেছেন, তাঁহারা প্রস্তর মূর্ত্তিবৎ দাঁড়াইয়া আছেন। এমন দৃশ্য কেহ কখনও দেখিয়াছে কি। রাত্রিতে সকলেই তাঁহার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিলেন। তিনি নিজেও বুঝিতে পারিলেন। শেষ রাত্রিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাত্রি প্রভাতের অধিক বিলম্ব আছে কি না। প্রভাত হইলেই 'রথ-দ্বিতীয়া।' পত্নীকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা দুঃখ করিও না, জীবন অনত্য, নিজে ভাল হইলেই জগৎ ভাল, আমি কোথায় যাইতেছি, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।" ভ্রাতাকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি শিক্ষিত হইয়াছ, শিক্ষার গৌরব রক্ষা করিয়া চলিও।" অতঃপর দিবামুখে তিনি ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন, ভক্তশিষ্যগণ তাঁহার সৎকার করিয়া আসিল। মৃত্যুর পরে দেখা গেল, ৺পণ্ডিত মহাশয়ের জমা খরচ সমান। তিনি কাহারও কোনও ঋণ রাখিয়া যান নাই।

জনৈক সহযোগী।

অশ্রুধারা।

দেব। কোথা চলি যাও?
এযে গো নিঠুর ধরা,
শত শঠতায় ভরা,
ছলনা চাতুরী হেথা ছুটিছে উধাও,
দয়া' মায়া-শূন্য দেশ,
ভরা শুধু স্বার্থ দ্বেষ,
কত শত প্রবঞ্চনা দেখিতেছি তাও—
স্বরগ দেবতা তুমি কোথা চলি যাও?

২

দেব। কোথা চলি যাও?—
মানবে যা' চাহে যত্নে,
যশঃ খ্যাতি, ধন, রত্নে,
রাজ্য বা সাম্রাজ্য সুখ শুধু "দাও দাও"
তুমি নহ সেই ভোগী,
মহাদেব, মহাযোগী,
শুদ্ধ-চেতা, আত্মজয়ী, কিছু নাই চাও,
কোন্ কামনায় তবে কোথা চলি যাও?

৩

দেব। কোথা চলি যাও?—
পবিত্র ধর্ম্মের মত,
কর্ম্ম যোগে সদা রত,
অথচ সরল শিশু হাসিয়া বেড়াও,
ও দেহের পূত গন্ধে,
প্রাণ ভ'রে মহানন্দে,
বচনে অমিয় মাখা জগত জুড়াও'
এহেন দেবতা তুমি কোথা চলি যাও?

৪

দেব। কোথা চলি যাও?—
নাহি জান পাপ তাপ,
নাহি জা'ন অনুতাপ,
ঢালিয়া জ্যোছনা-ধারা উল্লাস জাগাও,
কত ব্যথী কাছে আসে,
প্রাণ জুড়াবার আসে,
স্নিগ্ধ-বট-ছায়া সম আরাম বিলাও—
দয়ার দেবতা আজি কোথা চলি যাও?

৫

দেব। কোথা চলি যাও?—
প্রিয় পত্নী কন্যাগণে,
স্নেহ-বদ্ধ পরিজনে,
নিদারুণ রোগ জ্বালা বুঝিতে না দাও,
হিয়া মাখা মধুমতা,
সহেনা কাহারো ব্যথা,
নাহি জান কটু কথা, মমতা ছড়াও,
এ হেন দেবতা তুমি কোথা চলি যাও?

৬

দেব। কোথা চলি যাও?—
যৌবনে সোদর হারা,
সে ভাই "নয়ন তারা",
দেখিয়া মেটেনি সাধ—পলকে হারাও,
প্রৌঢ় কালে পুত্র ধনে,
শমন পাষাণ মনে,
কলিজা করিয়া খালি কেড়ে নিল তাও,
এ সব সয়েছ—পাছে পরে ব্যথা দাও।

৭

দেব। কোথা চলি যাও—
পরাপর নাহি বোধ,
শত্রুতার প্রতিশোধ,
ক্ষমা সাধুতায় তব সতত শিখাও,
অবনী খুঁজিলে আর,
তুলনা এ দেবতার
মিলে কি, করুণা করি কেহ বলি যাও,
মানবে দেবতা হেন দেখিব কোথাও?

৮

দেব। কোথা চলি যাও?—
যেখানে অমর দেশ,
নাহি পাপ, স্বার্থ, দ্বেষ,
নাহি রোগ, শোক, জরা, সেথানে কি যাও?
দেবতা বয়েছে কত,
করুণা, মমতা নিয়া, সেথানে কি চাও?
পাইবে যেখানে গেলে,
মাতা পিতা ভ্রাতা ছেলে,
স্নেহ প্রীতি ভক্তিময়, সেথানে কি যাও?
যেখানে "ভূপেন" আছে,
তার "কাকা বাবু" কাছে,
তোমা লাগি পথ চেয়ে—সেথানে কি যাও,
দয়া করি বল দেব! কোথা যেতে চাও?

৯

আর বলিব কি হায়?
সিক্ত-পঞ্চমীর উষা,
পরিয়া রুদ্রাক্ষ ভূষা,

৺জ্ঞানদাশঙ্কর বসু মহাশয়ের পরলোক-গমনে লিখিত। মৃত্যু—১৩১৯ সাল, ৯ই বৈশাখ, সোমবার, প্রত্যূষ ৫টা।

গৈরিক বসনাবৃতা সুমেরু মাথায়,
পবিত্র বৈশাখ মাস,
সমীরণ ফেলি শ্বাস,
কি তাবক ব্রহ্ম নাম যেন গো শুনায়.
আকাশে কনক ছবি,
আসেনি সে বাঙা রবি,
অচিব জাগ্রত পাখী হবি নাম গায়,
পবিত্রিতে বিশ্ব সৃষ্টি,
দেবে কবে পুষ্প বৃষ্টি,
এ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত ভবা পুণ্য তপস্যায়,
তোমারে ত্যজিল রোগ
ফুবাইল সব ভোগ,
স্মবিলে সে "ভগবান"। প্রণমিলে তাঁয়,
দিব্য নেত্রে দেব বথে,
হেবিযা বিমান পথে,
নয়ন হইল স্থির—কি হইল হায়।
খসিল হিমাদ্রি চূড়া,
পৃথিবী হইল গুঁড়া,
শূন্য তব বাজ-পুরী এ কি সহা যায়।
কি করিলে কহ আর্য্য!
একি দেবোচিত কার্য্য,
পতিবতা সতী তব বিধবা দশায়।
আমবা অনাথা-পাবা,
অভয়-আশ্রয-হাবা,
তুমি গেলে স্বর্গবাসে নিজ যোগ্যতায়,
হেথা এ অভাগীগণ দাঁড়াবে কোথায়?

শ্রীবীবকুমাব-বধ-বচযিত্রী।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। শেবশাহ। (সচিত্র), শ্রীরসিকচন্দ্র বসু প্রণীত, এবং ঢাকা কটন লাইব্রেবী হইতে প্রকাশিত। সিল্ক বাঁধাই ॥০, কাগজে বাঁধাই ।৵০। ছাপা ভাল। লেখকেব লিখিবাব ক্ষমতা বেশ আছে। কিন্তু ঐতিহাসিক জ্ঞান অধিক আছে বলিযা বোধ হয় না। আমবা বিকৃত ঐতিহাসিক তত্ত্বেব পক্ষপাতী নহি।

২। শ্রীশ্রীবাস-পঞ্চাধ্যায। শ্রীনলিনীবঞ্জন মিত্র কর্ত্তৃক পদ্যে অনূদিত। শ্রীযুক্ত শবচ্চন্দ্র শাস্ত্রী কর্ত্তৃক ভূমিকা-সম্বলিত। আমবা শাস্ত্রী মহাশযেব সহিত একমত হইযা বলি, নলিনী বাবুর পদবিন্যাসে নৈপুণ্য ও বসময়ী লেখনী পরিচালনাব শক্তি আছে।'

৩। নিবেদন। পদ্য, শ্রীনলিনীবঞ্জন মিত্র প্রণীত। মূল্য ।০। ভাষা ভাল, ভাব ভক্তি ও বৈরাগ্য-সূচক। লেখক কালে একজন শ্রেষ্ঠ কবি হইতে পারিবেন বলিযা আশা হয়।

৪। সিদ্ধার্থ। শ্রীবিনয়ভূষণ সবকাব কর্ত্তৃক পদ্যে নাটকাকারে বিরচিত। মূল্য ৵০। বালক বালিকাদিগের পাঠোপযোগী। ভাষা প্রাঞ্জল। সিদ্ধার্থেব পুণ্যময জীবনেব যত আলোচনা হয, ততই মঙ্গল।

৫। হৃদয-লহবী। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা, শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকাবী প্রণীত। মূল্য ।০। নবীন কবিব উদ্যম ও রুচি প্রশংসার্হ। স্থানে স্থানে বেশ কবিত্ব ফুটিযাছে।

৬। ভাব ও গাথা। সিটি কলেজেব ছাত্র শ্রীবমণীবঞ্জন সেন গুপ্ত প্রণীত। মূল্য ॥০। নবীন কবিব বচনায গুরুজনেব প্রতি ভক্তি ও ভগবৎ-প্রেমেব যথেষ্ট পবিচয় পাওযা যায়।

৭। শ্রীগৌরাঙ্গ। (সচিত্র), শ্রীযুক্ত বিধু ভূষণ সবকাব, বি-এ, প্রণীত এবং ঢাকা কটন লাইব্রেবী হইতে প্রকাশিত। মূল্য শিল্ক বাঁধাই ৸০। বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম-সংস্কাবক গৌরাঙ্গেব পুণ্যময জীবন কথাব যত প্রচাব হয, ততই মঙ্গল। গ্রন্থকাবেব বাঙ্গালা বচনাব, বোধ হয়, এই প্রথম উদ্যম। ছাপা, ছবি ও বাঁধাই ভাল।

৮। গৃহ-চিকিৎসা। শ্রীসারদাচরণ মুখো-

পাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। মূল্য ১।০। সংক্ষেপে এলোপ্যাথিক মতে প্রধান প্রধান রোগের কারণ, লক্ষণ, চিকিৎসা ও ঔষধের কথা বিবৃত হইয়াছে। মুর সাহেবের Family Medicine এর ধরণে লিখিত, কিন্তু তত বিশদ নহে। যে সকল স্থানে সহজে ডাক্তার কবিরাজ পাওয়া যায় না, সেই সকল স্থানে এই পুস্তক সাধারণের বিশেষ উপকারে আসিবে বলিয়া মনে হয়।

৯। সতীধর্ম্ম। শ্রীশরচ্চন্দ্র ধর প্রণীত, ঢাকা কটন লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। মূল্য কাগজের মলাট ॥০, কাপড়ের ৸০। উপন্যাস ও বাজে গল্প অপেক্ষা এরূপ স্ত্রীপাঠ্য পুস্তকের যত আদর হয়, ততই দেশের কল্যাণ। লেখকের ভাষায় অধিকার আছে। ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

১০। সচিত্র সপ্তকাণ্ড রাজস্থান। শ্রীবিপিন বিহারী নন্দী প্রণীত, মূল্য ২৲।

রাজস্থান কেবল রাজপুতনার ও রাজপুত জাতির আদরের বস্তু নহে। গ্রীসের ইতিহাস যেমন ইউরোপের গৌরব, রাজপুতের ইতিহাস তেমনই ভরতের গৌরব। এমন অদ্ভুত ইতিহাস যে জাতির ভাণ্ডারে রহিয়াছে, সে জাতি কভু চির-নিদ্রিত থাকিতে পারে না।

রাজপুত জাতির অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগ, আত্মবিসর্জ্জন, স্বদেশ-প্রেম ও কার্য্যপরায়ণতার দৃষ্টান্ত গৃহে গৃহে আলোচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। শৈশবে প্রাণে উচ্চভাব ও উচ্চাদর্শ বদ্ধমূল হইলে, ভবিষ্যৎ জীবন অন্যাকার ধারণ করে। ব্যক্তির সমষ্টিই জাতি। অতএব জাতি গঠন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে ব্যষ্টিগঠনে মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক। গৃহে, পরিবারে সমাজে, ক্রীড়াক্ষেত্রে, বিদ্যালয়ে, সভা সমিতিতে, পথে ঘাটে সর্ব্বত্র শিশুর সুশিক্ষা বিধান হওয়া উচিত। রাজস্থান আমাদের দেশের সাধারণ সম্পত্তি। রাজস্থানের গল্পে পৌরাণিক ও ঔপন্যাসিক অসত্যের আভাস অধিক নাই। অতএব তাহার দৃষ্টান্ত অনেক পরিমাণে সজীব ও বালক বালিকাগণের চিত্তাকর্ষক। এরূপ অমূল্য গ্রন্থের কোন সরল সংস্করণ ছিলনা বলিয়া আমাদের শিশুগণ তাহা কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীরামের মহাভারতের ন্যায় সম্ভোগ করিতে পারিত না। ইংরাজীর যে গদ্য অনুবাদ আছে, তাহা জটিল, নীরস ও বাহুল্যদুষ্ট। সে বিশাল সাগর হইতে রত্ন সংগ্রহ করিবার ধৈর্য্য ও ক্ষমতা কোমলমতি শিশুদিগের নিকট আশা করা যায় না। বিপিন বাবু রাজস্থানের প্রধান প্রধান বিষয়গুলি সরল পদ্যে বর্ণনা করিয়া বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থ মিবার, অম্বর, মারবার, বিকানীর, যশল্মীর, বুন্দি ও কোটা, এই সপ্তকাণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে। সপ্তকাণ্ড রামায়ণের সহিত মিল রাখিবার লোভ ত্যাগ করিতে না পারিয়াই তাঁহার এই কাণ্ড বিভাগ, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, তাঁহার এই চেষ্টা সম্পূর্ণ মৌলিক বলিতে হইবে। বিপিন বাবুর ভাষা প্রাঞ্জল, মধুর এবং সাধারণত দোষ-বর্জ্জিত। গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত রামায়ণের ন্যায় পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে বিবৃত। ভাষা ও ছন্দের উপর অসাধারণ ক্ষমতা না থাকিলে কবি এ বিপুল অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন না। নাটক, নভেল ও চুটকি গল্প ত্যাগ করিয়া, দৈত্যদানবের অসম্ভব অলীক গল্প গুজবের পরিবর্ত্তে, শিক্ষক ও অভিভাবকেরা বালক বালিকাদিগের হস্তে এইরূপ গ্রন্থ প্রদান করিলে তাঁহাদের নিজের এবং দেশের উপকার করা হইবে। কবির লেখনীতে বিধাতার আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক।

জীবনের সুখ দুঃখ।

জীব-মাত্রেই সুখের জন্য লালায়িত। সভ্যতার চরমসীমায় উপনীত মনুষ্য অতি নিকৃষ্ট চৈতন্য-বিশিষ্ট ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গের সহিত নির্ব্বিশেষে নিরন্তর সুখের চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়ায়। ইতর প্রাণী ও মনুষ্যের মধ্যে প্রভেদ এই যে, মনুষ্যের যেরূপ অশেষবিধ অভাব, তাহার সুখ দুঃখও সেইরূপ বিচিত্র। মানুষ আদিম অবস্থায় নিকৃষ্ট পশুর ন্যায় আহার নিদ্রা ও মৈথুন সুখেই সন্তুষ্ট থাকে। কিন্তু সে যতই সভ্যতার উচ্চতর পদবীতে ক্রমশঃ উন্নীত হইতে থাকে, ততই তাহার অভাবের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং সুখ দুঃখের পরিধিও সেই পরিমাণে বিস্তৃতি লাভ করে। আমি সুখের উল্লেখ করিতে করিতে দুঃখের কথা আনিয়া ফেলিয়াছি। বস্তুত, সুখ ও দুঃখ দুইটী যমজ সহোদর। যেমন দিবা ও রজনী, আলোক ও অন্ধকার, পুণ্য ও পাপ, উচ্চতা ও নিম্নতা, হ্রাস ও বৃদ্ধি, নৈকট্য ও দূরত্ব, সেইরূপ সুখ ও দুঃখ যুগ্ম পদার্থ। একের অভাবে অপরটীর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। এমন কি, সাঙ্খ্যপ্রবচনে দুঃখের অভাবই সুখ বলিয়া উক্ত হইয়াছে—"দুঃখাভাবঃ সুখম্"। দার্শনিক-চূড়ামণি প্লেটো ও প্রবন্ধলেখককুলধুরন্ধর মণ্টেন্‌ও ঠিক এই কথা বলিয়াছেন। সভ্যতার আলোক যেরূপ বহুদূরব্যাপী, তাহার ছায়াও সেইরূপ সুদূর-ব্যাপিনী। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক অভাব এত বাড়ে যে, পূরণ করা ক্রমে দুর্ঘট হইয়া উঠে। এই জন্য, সভ্যসমাজে আত্মহত্যার সংখ্যা যেরূপ দিন দিন বৃদ্ধি পায়, অসভ্য-জাতির মধ্যে, এরূপ দুর্ঘটনা অত্যন্ত বিরল। যাঁহারা টেনিসনের কবিতাপ্রিয়, তাঁহাদের অবিদিত নাই যে, আমাদের ভূতপূর্ব্ব রাজকবি বিজ্ঞানের এত উন্নতি সত্ত্বেও লণ্ডন নগরের শত শত হতভাগিনী রমণীর ও জন্মদুঃখী শিশুর শোচনীয় অবনতি দেখিয়া কি মর্ম্মভেদী বিলাপ করিয়াছিলেন। কবিবর কীটস্ বলেন যে, আমরা এখানে বসিয়া কেবল পর-স্পরের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করি। মহাকবি হাফেজ বলেন—এই বাগানের বুলবুল কেবল দুঃখের গানই গায়। বাস্তবিক, শশক যেমন তাহার ক্ষুদ্র দেহের ছায়া দেখিয়া ভয় পায়, সেইরূপ, মানুষ তাহার চারিদিকে দুঃখের ছায়া দেখিয়া সদাই সশঙ্ক থাকে। তাহার মনে হয় সুখে কাজ নাই, দুঃখ না আসিলে বাঁচি —"দুঃখাভাবঃ সুখম্"—সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল। তোমার হৃদয়ের ভালবাসা যতগুলি পাত্রে অর্পণ করিবে, তোমার হৃদয়দুর্গ তত-গুলি দ্বার দ্বারা আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা, জানিবে। যাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাস, তাহার অমঙ্গলে বা অসদাচরণে তোমার মর্ম্মে যখন দারুণ আঘাত লাগিবে, তখন তোমার মনে হইবে, হায়! কেন ভালবাসিয়াছিলাম? এখন যে "আমি স্বখাদ সলিলে ডুবে মরি।" শরবিদ্ধ পক্ষী যেমন মৃত্যুবাণে নিজের পালক দেখিয়া কাতর হয়, ছাগশিশু যদি জানিতে পারে যে তাহার জননীর দুগ্ধে তাহাকে স্নিগ্ধ করা হইবে, তাহা হইলে তাহার মনের অবস্থা যেরূপ হয়, গোদোহনকালে

ধেনুবৎস মাতৃজঙ্ঘায় আবদ্ধ হইলে তাহার মনে যেরূপ পরিতাপের উদয় হয়, পিঞ্জরস্থ পক্ষী যদি কোনও গতিকে টের পায় যে তাহার কারাগৃহটী তাহারই পূর্ব্বতন আশ্রয়তরুর প্রশাখা-নির্ম্মিত, তাহা হইলে তাহার হৃদয় যেরূপ ব্যথিত হয়, তোমারও মনের ভাব ঠিক্ সেইরূপ হইবে। সুখভোগ কালীন মনের উল্লাস যেমন তোমাকে উচ্চতম স্বর্গে তুলিবে, দুঃখভোগের সময়ে তুমি তেমনি ম্রিয়মাণ হইবে এবং মনের অবসাদ তোমাকে অতলস্পর্শ রসাতলে ডুবাইবে। যদি সুখের আশাকে হৃদয়ে স্থান দাও, তাহা হইলে তোমাকে বারবার নৈরাশ্য-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। অতএব যদি দুঃখের হাত এড়াইতে চাও, তবে সুখকে একেবারে বর্জ্জন কর। যেমন কূর্ম্ম তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি সঙ্কুচিত করিয়া তাহার কঠিন খোলার ভিতর উহাদিগকে সংরক্ষিত করিয়া বিপদ্ অতিক্রম করে, তুমিও সেইরূপ হৃদয়োত্থিত সুখ-লিপ্সাকে, দরিদ্রের মনোরথের ন্যায়, হৃদয়েই লীন হইতে দিও। এই উপদেশ আমাদের দেশের অনেক বড় বড় জ্ঞানী অতি প্রাচীন কাল হইতে দিয়া আসিতেছেন। প্রাচীন গ্রীসের "ষ্টোইক" সম্প্রদায়ও এই মতের পক্ষপাতী ছিলেন। অপর দিকে চার্ব্বাক, এপিকিউরস্ প্রভৃতি সুখবাদী পণ্ডিতদিগের মতে সুখভোগই পরম পুরুষার্থ। এই নশ্বর দেহের পতন হইবার পূর্ব্বে যে ব্যক্তি প্রাণ ভরিয়া সুখভোগ না করে, তাহার জন্মই বিফল। আমার বোধ হয়, সুখ দুঃখের প্রকৃততত্ত্ব নির্ণয় করিতে গেলে উপরোক্ত দুই মতের সামঞ্জস্যের প্রয়োজন, উভয় মতেই আংশিক সত্য নিহিত আছে। মানুষ যে সহজ সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া সুখের অন্বেষণ করে, তাহা নিরর্থক নহে। মনুষ্য সমাজ ও সভ্যতা এই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সুখ উপেক্ষার বস্তু নহে। কেহ কেহ মনে করেন যে, সুখ আমাদের প্রলোভনের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, ভোগের জন্য নহে। ভগবান্ সুখের টোপ ফেলিয়া ছিপ হাতে করিয়া বসিয়া আছেন, যে টোপ গিলিবে, তাহাকে নরকে চালান দিবেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের "পিউরিটান" সম্প্রদায় এইরূপ ধারণায় সুখ ভোগের নিতান্ত বিরোধী ছিলেন। তখন ইংলণ্ডের লোকেরা, কোনও প্রকাশ্য স্থানে সমবেত হইয়া, অতি নির্দ্দয়রূপে যষ্টি-প্রহৃত শৃঙ্খলাবদ্ধ অন্ধ ভল্লুকের বৃথা আস্ফালন ও যন্ত্রণা দেখিতে বড় ভালবাসিত। লর্ড মেকলে তাঁহার প্রসিদ্ধ ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, পিউরিটানেরা এই নৃশংস ক্রীড়া রহিত করিয়াছিলেন—ভল্লুকের যন্ত্রণা দূর করিবার জন্য নহে, দর্শকবৃন্দের আমোদ ঘুচাইবার জন্য।

সুখ যে আমাদের ভোগের জন্য সৃষ্ট, এই বিংশ শতাব্দীতে তাহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা নিষ্প্রয়োজন। এ বিষয়ে মনুষ্যের সাধারণ জ্ঞানের সহিত বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ ঐকমত্য। সংসারে সুখভোগ করিতে গেলে কিয়ৎ পরিমাণে দুঃখভোগ করিতে হইবে বলিয়া সুখকে একেবারে বর্জ্জন করা কোন মতে যুক্তিসিদ্ধ নহে। দুঃখ না থাকিলে সুখের উপলব্ধি হইবে কিরূপে? প্রাচীন গ্রীক্দিগের মধ্যে একটী কথা প্রচলিত ছিল যে, দেবতারা আমাদিগকে কোন কাম্য বস্তু বিনামূল্যে দেন না। বাস্তবিক, দুঃখই সুখের মূল্যস্বরূপ। জল, বায়ু, সূর্য্যালোক প্রভৃতি কতিপয় বস্তু ছাড়া আমরা কোন্ দ্রব্য বিনা পরিশ্রমে লাভ করি? এবং কে বলিবে যে পরিশ্রমে দুঃখ নাই? কুসুমে কণ্টক আছে বলিয়া কে

কুসুম চয়নে বিরত হইবে? প্রেমে বিয়োগ আছে বলিয়া কে প্রেমের সুখে বঞ্চিত হইবে? একজন প্রেমিক কবি বলেন যে, প্রেমের যন্ত্রণাও, অন্য যে কোনও সুখের অপেক্ষা, অধিকতর প্রার্থনীয়। আর একজন কবি বলেন, যে কখনও প্রেম করে নাই, তাহার চেয়ে যে প্রেম করিয়া হারাইয়াছে, সে বেশি সুখী। একজন সংস্কৃত কবি বলেন—

"জায়মানো হরেদ্দারান্ বর্দ্ধমানো হরেদ্ধনম্।
ম্রিয়মাণো হরেৎ প্রাণান্ কথং পুত্রঃ সুখাবহঃ।

পুত্র জন্মিয়াই স্ত্রী কাড়িয়া লয়, পুত্রের যত বয়োবৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই তাহার লালন পালনে পিতার ধনক্ষয় হয়, এবং সে মরিয়া গেলে পিতার প্রাণ হরণ করে। তবে পুত্রকে কিরূপে সুখের আকর বলা যায়? কিন্তু তাই বলিয়া কে কবে পুত্রমুখ দেখিয়া চরিতার্থ না হয়? জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুঃখবোধের মাত্রা বাড়িয়া যায় বলিয়া, যে একবার জ্ঞানের আস্বাদ পাইয়াছে, সে কি জ্ঞান চর্চ্চায় বীতস্পৃহ হয়? সংশয় চিন্তাশীলতার একটী আনুষঙ্গিক ফল বলিয়া কি আমাদিগকে পশুবৎ চিন্তা হইতে বিরত হইতে হইবে? একজন কবি বলেন, যে কখনও অসুখী হয় নাই, সে কিরূপে সুখী হইবে? যদি সম্বৎসর কেবল ক্রীড়া কৌতুকে কাটিত, তাহা হইলে ক্রীড়াও বিরক্তিকর হইত। দুঃখের ঘোর কৃষ্ণবর্ণের উপর সুখের উজ্জ্বলবর্ণ বেশ ফুটিয়া উঠে। সুখের পর যেরূপ দুঃখের উদয় হয়, সেইরূপ, অনেক সময়ে প্রায় দুঃখের সঙ্গে সঙ্গে সান্ত্বনা দেখা দেয়। আশা যেমন বর্ত্তমান সুখ বাড়াইয়া দেয়, সেইরূপ, স্মৃতি অতীত দুঃখের উপর এমন এক মোহকর আবরণ বিছাইয়া দেয় যে, উহা এক নূতন সুখে পরিণত হয়। বাস্তবিক সুখ ও দুঃখের এত ঘনিষ্ঠ যোগ যে, উহারা যেন এক বৃন্তে দুইটী ফুল। লোকে যেমন মর্ম্মাহত হইলে অশ্রুপাত করে, সেইরূপ, আনন্দের আতিশয্যেও অশ্রু বিসর্জ্জন করে। অনেক সময়ে সুখের চিন্তা মনে বিষাদের ভাবনা আনিয়া দেয়। সুখের তার দুঃখের তারের সহিত" এরূপ বিজড়িত যে, একটীতে ঘা পড়িলে অপরটী আপনা হইতে বাজিয়া উঠে। যখন সুখের ভরা উথলিয়া উঠে, হৃদয় তখন সহজেই বিপদ আশঙ্কা করে—

"নিষড়ে বঁধুয়া, তবু বিচ্ছেদে বাউরী।"

একজন ভাবুক বলেন, যেমন কোন কোন 'মিল" (পেষণ-যন্ত্র) বায়ুর গতি সহকারে চলে এবং কোনটী বা জলের গতি সহকারে চলে, সেইরূপ, হাসির বাতাস ও চক্ষের জল মানব-হৃদয়কে সমভাবে চালিত করে।

যে সকল সুধীগণ আমাদিগকে দুঃখের ভয় দেখাইয়া সুখান্বেষণ হইতে নিবৃত্ত হইতে বলেন, তাঁহাদের উপদেশ একেবারে নিরর্থক নহে। আমরা যখন কোনও বস্তুর কামনা করি, তখন আমরা কেবল উহার গুণই দেখি, দোষের দিক্ লক্ষ্য করিনা, কিন্তু যখন উহা আমাদের হাতে আসে, তখন আমরা কেবল উহার দোষই দেখি। আমরা যখন কোনও সুখলাভের জন্য ব্যগ্র হই, তখন যদি আমরা স্থির চিত্তে উহার আনুষঙ্গিক দুঃখের কথা ভাবি, তাহা হইলে হয়ত আমরা ঐ সুখ বর্জ্জন করি এবং উহার আনুষঙ্গিক দুঃখ হইতে অব্যাহতি পাই। বিজ্ঞবর ফ্যাংক্লিন্ বলেন যে, মানুষ অভিলষিত বস্তুর অতিরিক্ত মূল্য নিরূপণ করে বলিয়া জীবনে এত কষ্ট পায়। আকাশের তারার ন্যায় উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ পূজিত হন বটে, কিন্তু বিশ্রামসুখে জলাঞ্জলি দেন। সামান্য লোকে যে সকল মনের সুখ সম্ভোগ

করে, তাঁহারা উহাতে অনেক পরিমাণে বঞ্চিত হন। এমন কি, তাঁহাদের জীবনই স্বায়ত্ত থাকে না। এই সকল ভাবিয়া দেখিলে অনেকের মন হইতে দুরাকাঙ্ক্ষা দূর হইবার সম্ভাবনা। সুখভোগে মত্ত হইয়া লোকে দুঃখের কথা ভুলিয়া যায়। যখন দুঃখ আসে, তখন তাহারা একেবারে ম্রিয়মান হইয়া পড়ে। কিন্তু যদি তাহাদিগকে দুঃখের কথা স্মরণ করাইয়া পূর্ব্ব হইতে দুঃখভোগের জন্য প্রস্তুত করা যায়, তাহা হইলে তাহারা কষ্টে পড়িলে ততটা মুহ্যমান হয় না। সুখের জন্য লালায়িত হইয়া লোকে যখন সুখের অনুসরণে হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হয়, তখন যদি তাহারা সুখের অনিত্যতা ও স্বার্থপরতার বিষময় পরিণাম সম্বন্ধে উপদেশ পায়, তাহা হইলে কে বলিবে যে, সে উপদেশ তাহাদের বিশেষ হিতকর নহে? সুখভোগের পূর্ব্বে সংযমশিক্ষা করিলে সুখভোগে মত্ততা জন্মে না এবং সুখভোগের ক্ষমতাও অধিক দিন থাকে; কারণ উৎকট সুখ বেশী দিন ভোগ হয় না। সুখবাদীরা সুখকেই জীবনের লক্ষ্য মনে করেন, কিন্তু সুখকে সুখ বলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিলে সে অনেক সময়ে ধরা দেয় না। যে স্বার্থপর নরাধম কেবল আপনার সুখ লইয়াই বিব্রত, সে পরিণামে কখনই সুখী হইতে পারে না। যে স্বার্থত্যাগী নরপুঙ্গব আপনার সুখ দুঃখে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, কেবল কর্ত্তব্য-সাধনকেই জীবনের লক্ষ্য করেন, সুখ আপনি আসিয়া তাঁহার গলায় বরমাল্য পরাইয়া দেয়। তিনি পরের সুখে সুখী হইয়া যে ভূমানন্দ উপভোগ করেন, তাহা আত্মসুখরত নীচাশয়ের বোধাতীত। যে সুখ নৈতিক ভিত্তির উপর সংস্থাপিত, সেই সুখই প্রকৃত সুখ। মানুষের নৈতিক আদর্শ যতই উন্নত হইবে, সে ততই আত্মোৎসর্গে সুখী হইবে। আত্মবিসর্জ্জনের প্রথম শিক্ষা হয়, দম্পতীর প্রেমে। দম্পতী যে পরিমাণে পরস্পরের আমিত্বকে তুমিত্বে পরিণত করিতে পারেন, তাঁহারা ঠিক সেই পরিমাণে প্রেমের অনির্ব্বচনীয় সুখ অনুভব করেন। আত্মবিসর্জ্জনের দ্বিতীয় শিক্ষা হয়, সন্তান-বাৎসল্যে। সন্তানের জন্য পিতা-মাতাকে পদে পদে কতই ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তাঁহারা সন্তান স্নেহের গুণে কোনও কষ্টকে কি কষ্ট বলিয়া মনে করেন? এইরূপে পারিবারিক জীবনে যে শিক্ষার সঞ্চার হয়, তাহার বিকাশে লোকে যদি ক্রমান্বয়ে প্রতিবেশীর জন্য, স্বগ্রাম বা নগরবাসীর জন্য, স্বদেশের জন্য এবং পরিশেষে সমগ্র মানব জাতির জন্য আত্মবিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে এই দুঃখময় পৃথিবীতে কি সুখের বৈকুণ্ঠের আবির্ভাব হয়। আহা! পৃথিবীতে দুঃখের কি অবধি আছে? একেত জলবিম্বের ন্যায় মানব-জীবন, এই আছে এই নাই; আমাদের সুখ আবার আমাদের নশ্বর দেহ অপেক্ষাও ক্ষণস্থায়ী। একটী ক্ষুদ্র মশকের গুঞ্জনে যেমন অতি মধুর স্বপ্ন ভঙ্গ হয়, সেইরূপ অতি সামান্য কারণে আমাদের সুখের ব্যাঘাত ঘটে। মনুষ্যেতর জীব কেবল বর্ত্তমান দুঃখভোগে কাতর; কিন্তু মানুষ তদ্ব্যতিরিক্ত অতীত দুঃখের স্মরণে ও ভাবী দুঃখের আশঙ্কায় কাতর হয়: বর্ত্তমান দুঃখভোগে অতীত সুখের স্মৃতিও মানুষকে কত ব্যথিত করে। প্রতিমুহূর্ত্তে কত শত অভাগার হৃদয় ভগ্ন হয়। কত লোক এক কালে সুখী ছিল বলিয়া এখনও সুখের ভান করিয়া দেঁতোর হাসি হাসে! কত লোক সোণার অলঙ্কারে দুঃখের বোঝা ঢাকিয়া বেড়ায়। কত লোকের ক্ষুধা আছে অন্ন নাই,

আবার কাহারও বা অন্নাভাব নাই, কিন্তু পরিপাকে শক্তির অভাব। পৃথিবীর প্রত্যেক কাঠা পরিমাণ ভূমিখণ্ড এতদবধিকাল যত দুঃখ ও শোক দেখিয়াছে, তাহা যদি বর্ণনা করিতে পারিত, তাহা হইলে কে আর রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড্ এত আগ্রহের সহিত পাঠ করিত? মানুষ যতই সতর্ক হইয়া চলুক না কেন, সে কখনই দুঃখভোগ হইতে একেবারে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিবে না। কেহ কেহ বহুদিন সুখে কাটাইয়া শেষ দশায় এমন কষ্টে পড়ে যে, তখন মনে হয় যেন তাহাদিগকে সহসা আক্রমণ করিবে বলিয়া দুর্ভাগ্য এতদিন ওৎ করিয়া বসিয়াছিল। এক মুহূর্ত্তে এমন সর্ব্বনাশ ঘটে, যে তাহার ক্ষত চিহ্ন আমরণ থাকিয়া যায়। হঠাৎ এমন বিপদ্ আসিয়া উপস্থিত হয় যে, উহার আপাতে অতি ধীর ব্যক্তিরও ধৈর্য্যচ্যুতি হয়। রামচন্দ্র যখন রাজ্যাভিষেকার্থ আহূত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার মুখের ভাব যেরূপ ছিল, পিতার আদেশে বনবাসযাত্রাকালে তাঁহার কোনও বৈলক্ষণ্য দেখা যায় নাই।

"আহূতস্যাভিষেকায় বিসৃষ্টস্য বনায় চ।
ন ময়া লক্ষিতস্তস্য স্বল্পোঽপ্যাকার বিভ্রমঃ॥

কিন্তু সীতার বিরহে সেই রামচন্দ্রেরও ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়াছিল। তিনি লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন—

"সোঢ়ং ময়া তে বিয়োগঃ সোঢ়ো রাজ্য
বিয়োগোঽপি।
সোঢ়ো বনে বাসঃ সোঢ়ুং ন ভবামি
জানকীবিরহম্॥"

"আমি পিতৃবিয়োগ সহ্য করিয়াছিলাম, রাজ্যচ্যুতিও সহ্য করিয়াছিলাম, বনবাসের কষ্টও সহ্য করিয়াছিলাম, কিন্তু জানকীর বিরহ কোনক্রমে সহ্য করিতে পারিতেছি না।"

যে দুঃখে অবিরল অশ্রুপাত হয়, সে দুঃখের গভীরতা ঐ উপায় অবলম্বনে অনেকটা হ্রাস পায়। কিন্তু যে নীরব দুঃখে হৃদয়ের তন্তু পর্য্যন্ত ছিঁড়িয়া যায়, তাহার উপশমের জন্য চক্ষু হইতে এক ফোঁটা জলও পড়ে না, মুখ হইতে একটী বিলাপও নিঃসৃত হয় না। কখন কখন দুঃখের আতিশয্যে লোকে বিলাপের পরিবর্ত্তে ব্যঙ্গ ও পরিহাস অবলম্বন করে। লোকে যখন দুঃখে মৌনাবলম্বন করে, তখন তাহাদের হৃদয় দুঃখের পুটপাকে পুড়িতে থাকে। মহাকবি সেক্‌স্‌পীয়ার্ ঠিক্ বলিয়াছেন যে, যখন আমরা কাহারও দুঃখের অবসান হইয়াছে মনে করি, তখন উহা প্রকৃত পক্ষে শেষ হয় নাই।

মানুষের অসীম দুঃখ নানা কারণে সমুৎপন্ন হয়, কতক তাহার নিজের কর্ম্মদোষে, কতক কালপ্রভাবে, কতক দুর্দ্দৈববশতঃ, কতক মানুষের প্রতি মানুষের অত্যাচার নিবন্ধন। প্রথম ও শেষোক্ত কারণ-জনিত দুঃখ; দ্বিতীয় ও তৃতীয় কারণ-জনিত দুঃখের ন্যায়,অনিবার্য্য নহে, কিন্তু উহা অপনোদনের জন্য মানুষের যে নৈতিক উৎকর্ষের প্রয়োজন, হায়, সে উৎকর্ষ মানুষ কবে লাভ করিবে? মানুষ যদি অবিচলিত ভাবে অনুক্ষণ হিত পথ অনুসরণ করিত এবং দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচার যদি একেবারে লোপ পাইত, তাহা হইলে দুঃখের সমষ্টির কি অপরিমেয় লাঘব ঘটিত। মানুষ যদি পরস্পরের দুঃখে আন্তরিক সহানুভূতি বোধ করিত এবং উহার প্রতিকারের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিত, তাহা হইলে দুর্দ্দৈব-জনিত দুঃখও কত খর্ব্ব হইত। হায়! কবে আমরা কবির উপদেশ কার্য্যে পরিণত করিতে সক্ষম হইব?

"আপনারে ল'য়ে বিব্রত রহিতে

আসে নাই কেহ অবনী 'পরে
সকলের তরে সকলে আমরা,
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।"

বৈজ্ঞানিক-চূড়ামণি ডারুইন্ জীব-জগতের যে নিয়ম আবিষ্কার করিয়া যশস্বী হইয়াছেন, তদনুসারে জীবন-সংগ্রামে দুর্ব্বলের অবশ্যম্ভাবী পরাজয়। কিন্তু মহামতি হক্সলি বলেন যে, মনুষ্যসমাজের ক্রমোন্নতি যে নৈতিক বিধি পালন-সাপেক্ষ, তদনুসারে আমাদিগকে উপরোক্ত প্রাকৃতিক নিয়মের ঠিক বিপরীত দিকে চলিতে হইবে, অর্থাৎ মানুষ যতই উন্নত হইবে, ততই দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের সহানুভূতি বাড়িবে। বর্ত্তমান সভ্যজগতে দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচারের যেরূপ প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাই, তাহাতে কিন্তু মনে হয়, উহা যে কোন কালে লোপ পাইবে, তাহার আশা সুদূরপরাহত।

একজন সাধু মহাত্মা বলিতেন, "আমি এ সংসারে মানব জাতির সুখ ও দুঃখের দুইটী স্তূপ দেখিতে পাইতেছি, যদি আমি দুঃখের স্তূপের এককণামাত্র কমাইতে পারি এবং সুখের স্তূপে এককণামাত্র যোগ করিতে পারি, তাহা হইলে আমি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিব।" বাস্তবিক, কোনও ব্যক্তির কর্ম্মক্ষেত্র যতই সঙ্কীর্ণ হউক না কেন, তিনি যদি উহার পরিধির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুখ বিস্তার ও দুঃখ দূর করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার দেশের ও সমগ্র পৃথিবীর একজন প্রকৃত হিতকারী বন্ধু বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য।

আমি এতক্ষণ মনুষ্যের সুখ দুঃখের বিষয় সাধারণভাবে আলোচনা করিয়াছি। কি উপায়ে মানুষ ব্যক্তিগত সুখ লাভ করিতে পারে, এখন তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। যদি যথার্থ সুখী হইতে চাও, তবে সর্ব্ব প্রথমে মনকে সুখ ভোগের উপযোগী কর; কারণ প্রকৃত সুখ মনেই। মনেই স্বর্গ, মনেই নরক। একজন ইংরাজ কবি বলেন—"আমার মনই আমার রাজ্য।" সংস্কৃত কবিও ঠিক তাই বলেন—"কবিতা যদ্যস্তি রাজ্যেন কিম্?" যদি কবিতা থাকে, তবে রাজ্যে কি প্রয়োজন!

এক এক জন লোকের মন এরূপ কাব্যময় যে, সে অতি সামান্য উপাদান লইয়া বিপুল সুখের সৃষ্টি করে। যেমন কোনও জ্যোৎস্নাময়ী তটিনীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ উত্থিত হয় এবং অবিলম্বে মিলাইয়া যায়, সেইরূপ, একটী প্রফুল্লতাপূর্ণ চিত্তে দুঃখের বুদ্বুদ উঠিতে না উঠিতে বিলীন হয়। পক্ষান্তরে এক এক জন লোক স্বভাবতই এরূপ নিরানন্দ যে, তাহাদের মুখ দেখিলে উৎসবের হাসিও বিষাদের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়। কোনও কোনও লোককে কেহই সন্তুষ্ট করিতে পারে না। এরূপ প্রকৃতির লোক, যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট করিতে পারেনা, তাহার অপেক্ষাও শত গুণ অসুখী। হাত-লণ্ঠনের যেমন একদিক আলোকময় ও অপর দিক্ তমোময়, মানব-জীবনেও সেইরূপ একদিকে আলো ও অপর-দিকে আঁধার। আমি আলোর দিক্ দেখিতে বড় ভালবাসি, এবং যিনি আমাকে আলোর দিক দেখাইয়া দেন, আমি তাঁহার নিকট চিরঋণী। প্রসিদ্ধ দার্শনিক হিউম বলিতেন যে, সালিয়ানা লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া ভূমিষ্ঠ হওয়া অপেক্ষা এইরূপ আলোক-প্রবণ মন লইয়া জন্মগ্রহণ করা অধিক সৌভাগ্যের কথা। আমি এক জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ দয়ার লাগর চিকিৎসককে জানিতাম, যিনি এইরূপ মন লইয়া জন্মগ্রহণ

করিয়াছিলেন। তিনি এরূপ সদানন্দ ছিলেন যে, সকল বিষয়েরই ভালদিকটী দেখিতেন। একবার তিনি হুগলি জেলার অন্তঃপাতী কোনও গ্রাম (তাঁহার পৈত্রিক বাসস্থান) হইতে কলিকাতায় আসিতেছিলেন। এমন সময়ে পথিমধ্যে গ্রাম্যকেরাঞ্চির চাকা ভাঙ্গিয়া গেল। এই দুর্ঘটনায় তাঁহার সঙ্গীরা বড়ই উদ্বিগ্নচিত্ত হইলেন, কারণ, তখন বর্ষার প্রভাবে বেলোয়ে ষ্টেসনে যাইবার পথ কর্দ্দম-পিচ্ছিল, ট্রেণ ধরিবার সময়ও সংক্ষিপ্ত। কিন্তু, তিনি কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া তাঁহার সঙ্গীদিগকে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমরা ত কলিকাতায় প্রত্যহই গাড়ী চড়িয়া থাকি, কিন্তু পল্লীগ্রামের এরূপ গাড়ী-বিভ্রাট এক নূতন আমোদ।"

সুখকে নিজের আয়ত্ত করিতে হইলে যত্নপূর্ব্বক সন্তোষ অভ্যাস করিতে হইবে। কে কবে আশার অবধি নির্ণয় করিতে পারিয়াছে? আশার অগ্নিতে যতই আহুতি দিবে, উহা ততই অধিকতর প্রজ্বলিত হইবে। আশার পূরণে আশার নিবৃত্তি হয় না। সন্তোষই আশা-নিবৃত্তির একমাত্র উপায়।

"সর্ব্বাঃ সম্পত্তয়স্তস্য সন্তুষ্টং যস্য মানসং।
উপানদ্গূঢ় পাদস্য নন্থ চর্ম্মাবৃতৈব ভূঃ॥"

যাঁহার মন সন্তুষ্ট, সকল সম্পত্তিই তাঁহার আয়ত্ত। সমস্ত পৃথিবী চামড়া দিয়া ঢাকা অসম্ভব, কিন্তু কেহ যদি চামড়ার জুতা পায়ে দিয়া বেড়ায়, তাহা হইলে তাহার মনে হইবে যেন সমস্ত পৃথিবীই চর্ম্মাবৃত।

সন্তোষ লাভ করিতে গেলে দৃষ্টিকে ঊর্দ্ধ হইতে নামাইয়া অধোদিকে প্রসারিত করিতে হইবে।

"অধোঽধঃ পশ্যতঃ কস্য মহিমানোপচীয়তে।
উপর্য্যুপরি পশ্যতঃ সর্ব্ব এব দরিদ্রতি॥"

যে যত নিম্নদিকে চায়, তাহার মহিমা তত্তই বাড়িয়া যায় এবং যে যত উপর দিকে চায়, সে আপনাকে ততই দরিদ্র বোধ করে। সেখ সাদির গোলেস্তায় বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তির পায়ে জুতা যোটে নাই বলিয়া সে বড় দুঃখিত ছিল, কিন্তু সে যখন মসজিদে গিয়া দেখিল যে এক ব্যক্তির পা নাই, তখন সে আপনাকে ধন্য মনে করিল।

সন্তোষ-পরায়ণ লোক যেরূপ সুখভোগের জন্য বিশেষ ব্যগ্র হন না, সেইরূপ, তাঁহারা দুঃখ-ভোগেও ততটা কাতর হন না। আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলেন—

"সুখং বা যদি বা সুখং প্রিয়ং বা যদি বা প্রিয়ং।
প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাসীত হৃদয়েনা পরাজিতা॥"

সুখই হউক বা দুঃখই হউক, প্রিয়ই হউক বা অপ্রিয় হউক, যখন যাহা আসিয়া উপস্থিত হইবে, তখন তাহা অপরাজিত হৃদয়ে সেবন করিবে। প্রাচীন রোমের সম্রাট মার্কস অ্যাণ্টোনাইনসও ঠিক এই উপদেশ দেন। তিনি বলেন—"ভাগ্যের দান গর্ব্বিত না হইয়া গ্রহণ করিবে এবং ক্ষুব্ধ না হইয়া ত্যাগ করিবে।" সুখ দুঃখ সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা উচ্চতর উপদেশ কে দিতে পারে? কিন্তু এই উপদেশ অনুসারে কয়জন লোক চলিতে পারে?

"সম্পদি যস্য ন হর্ষো বিপদি বিষাদো রণে চ ধীরত্বম্।
তং ভুবনত্রয়তিলকং জনয়তি জননী সুতং বিরলম্॥"

যিনি সম্পদে হৃষ্ট হন না, বিপদে বিষণ্ণ হন না এবং যুদ্ধে ধীর থাকেন, এরূপ ত্রিভুবন-তিলক পুত্রকে জননী কালে ভদ্রে জন্ম দেন।

পূর্ব্বোক্ত উপদেশ ব্যতীত এমন কতকগুলি উপদেশ দেওয়া যাইতে পারে, যাহা

পালন করা তত কঠিন নহে, অথচ তদনুসারে চলিলে ব্যক্তিগত সুখ অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়।

অনেকে কাব্যে ও উপন্যাসে সুখের যে সকল অলৌকিক ও অতিরঞ্জিত চিত্র দেখিতে পায়, তাহারই আদর্শে নিজ নিজ জীবনের সুখ কল্পনা করে, সুতরাং যে সুখ সাধারণ মানব জীবনে সুলভ, তাহাতে তাহাদের মন উঠে না এবং তৃষাতুর মৃগ যেমন মরীচিকার উদ্দেশে ধাবমান হয়, সেইরূপ তাহারা উৎকট সুখের অন্বেষণে বৃথা কালক্ষেপ করে। মানুষ যদি প্রথম বয়সে অনায়াস-লভ্য সুখে তৃপ্তিলাভ করিতে শিক্ষা করে, তাহা হইলে সে ঐ শিক্ষার গুণে, আজীবন সুখে কাল কাটাইতে পারে। আমরা যখন আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রের দীপ্তি দেখিয়া মোহিত হই এবং নক্ষত্রলোকে বাস করিবার কামনা করি, তখন আমরা ভুলিয়া যাই যে, সেখানকার উত্তাপে আমাদের দেহ নিমেষ মধ্যে ভস্মসাৎ হইবে, আমাদের পক্ষে এই দীপ্তিহীন পৃথিবীই ভাল। সেইরূপ, উৎকট সুখের লালসায় অনেকে প্রকৃত সুখ উপেক্ষা করে। অনেকে আবার দুঃখের ভয়ে এত ভীত হয় যে, তাহারা বাস্তবিক দুঃখ আপতিত হইলে যত না যাতনা ভোগ করে, দুঃখের আশঙ্কায় তদপেক্ষা শত গুণ অধিক যন্ত্রণা ভোগ করে। এরূপ প্রকৃতির লোক বর্ত্তমান সুখে সুখী না হইয়া সুদূর ভবিষ্যতে দুঃখ ঘটিতে পারে, এই ভাবিয়া কাতর হয়। এক জন তত্ত্বদর্শী পণ্ডিত এই জন্যই বলেন, যদি সুখী হইতে চাও, তবে অত দূরদর্শী হইলে চলিবে না, ভবিষ্যদ্দৃষ্টির প্রসর খর্ব্ব কর। ভবিষ্যতে দুঃখ ভোগ হইতে পারে বলিয়া বর্ত্তমান বিশুদ্ধ আমোদ কেন পূর্ণমাত্রায় ভোগ করিবে না? কোন বিশুদ্ধ সুখভোগ করিবার সময় মনে এই ভাবিবে, "আমার ভাগ্যে ভবিষ্যতে যাহাই থাকুক, আমি এখন প্রাণ ভরিয়া প্রকৃত সুখভোগ করিলাম।" প্রাণ ভরিয়া সুখ ভোগ করার দৃষ্টান্ত স্বরূপ এক জন ভাবুক বলেন, যদি তুমি সারাদিন খাটিয়া শয়নের পূর্ব্বে আপনাকে পাঁচ মিনিটের জন্য সুখী বোধ কর, তাহা হইলে ঐ সুখের মাত্রা এরূপভাবে বাড়াইয়া লইবে যেন উহার ভোগকাল এক শতাব্দী পরিমিত।

যাহারা কিয়ৎকালের জন্য নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগ করে, তাহারা অভ্যস্ত সুখে হতাদর হইয়া নানাবিধ দুঃখের কল্পনা করে। কিন্তু প্রকৃত দুঃখের সংঘর্ষে এরূপ কাল্পনিক দুঃখ এক মুহূর্ত্তও তিষ্ঠিতে পারে না। বিষ যেমন বিষের ঔষধ, সেইরূপ সামান্য দুঃখ প্রায় গুরুতর দুঃখে লয় প্রাপ্ত হয়। কিন্তু কখন কখন গুরুতর দুঃখ সত্ত্বেও সামান্য দুঃখ অধিক ক্লেশ কর হয়। ভূদেব বাবু তাঁহার "পারিবারিক প্রবন্ধ" পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, একবার এক ব্যক্তি তাঁহার কোনও বিশেষ বন্ধুর পীড়ার সংবাদ পাইয়া উক্ত বন্ধুর বাটী গমন করেন। পথে বেলগাড়ীর কয়লার গুঁড়া তাঁহার চক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে এরূপ অস্থির করিয়াছিল যে তিনি বন্ধু-সদনে উপস্থিত হইয়া বন্ধুর মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া শোক প্রকাশ করা দূরে থাকুক, প্রথমেই চক্ষু হইতে কয়লার গুঁড়া বাহির করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবে বিদ্রোহীরা মাদাম দেলারশ্ জাকেলীন্ নামক একজন সম্ভ্রান্ত মহিলার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া তাঁহার স্বামীকে আহত করে। পতিপ্রাণা সাধ্বী শত্রুহস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার জন্য পলায়নের উদ্যোগ করিলেন এবং আহত

স্বামীর ভুলির সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং পদব্রজে যাত্রা করিলেন। তখন তাঁহার মনের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা বলা বাহুল্য, কিন্তু এত মনের কষ্ট সত্ত্বেও তাঁহার পরিহিত সঙ্কীর্ণ-পরিসর পাদুকার চিম্‌টি তাঁহাকে সমধিক ব্যথিত করিয়াছিল।

লোকে বিপদে পড়িয়া প্রাণপণে তাহার প্রতিকারের চেষ্টা পায়, কিন্তু যখন উহা হইতে উদ্ধারের কোন উপায় দেখিতে পায় না, তখন নিরতিশয় সাংঘাতিক বিপদেও ঔদাসীন্য অবলম্বন করে। অনেক বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকার একজন আদিম-নিবাসীর ডিঙ্গি দুর্দ্দৈবক্রমে নায়াগারা জলপ্রপাতের ভীষণ ভ্রমি-সঙ্কুল প্রবাহের সান্নিধ্যে আসিয়া পড়ে। ডিঙ্গির অধিস্বামী প্রথমতঃ আত্মরক্ষার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিল, শেষে হতাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিল এবং নৌকার খোলে শুইয়া পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে গান ধরিল। আমাদের দেশে একটী চলিত কথা আছে—"অল্প শোকে কাতর, বিস্তর শোকে পাথর।" বাস্তবিক আমরা জীবনের গুরুতর দুঃখভোগ করিবার সময় যেরূপ ধৈর্য্য অবলম্বন করি, জীবনের ছোট ছোট দুঃখভোগের সময় ততটা ধৈর্য্য থাকে না। প্রসিদ্ধ চিত্রকর সার জশুয়া রেনোল্ডসের ন্যায় সদানন্দ লোক অতি বিরল, তিনি বলিতেন, যদি এই সংসারে সুখী হইতে চাও, তাহা হইলে ছোট ছোট দুঃখকে মনে স্থান দিও না।"

আমরা সুখ চিরস্থায়ী নহে বলিয়া আক্ষেপ করি, কিন্তু দুঃখও ত চিরস্থায়ী নহে। এই কথাটী সর্ব্বদা স্মরণ করিলে আমাদের তিতিক্ষা শক্তি যে সমধিক বৃদ্ধিলাভ করে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমি একবার সমুদ্রপথে কলম্বো যাত্রা করি। জাহাজ বঙ্গোপসাগরে পঁহুছিবামাত্র আমি অকস্মাৎ সামুদ্রিক পীড়ায় অভিভূত হইলাম। ঐ পীড়াগ্রস্ত লোকের মন কিরূপ অবসন্ন হয়, তাহা কেবল ভুক্ত-ভোগীই জানেন। যতদিন পীড়াভোগ করিয়াছিলাম, ততদিন প্রায় অনাহারে ছিলাম, এক বিন্দু জলও গলাধঃকরণ হইত না। পেটে কিছুই সহিত না, বমনের রুচি মুখে করিয়া কথঞ্চিৎ তৃষ্ণা নিবারণ করিতাম। দিবা রাত্রি ক্যাবিনে শয্যাশায়ী হইয়া ভাবিতাম, বুঝি ঐ পীড়ার হস্ত হইতে কখনই অব্যাহতি লাভ করিতে পারিব না। সে সময়ে আমার মনের এরূপ শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছিল যে, কতিপয় সহযাত্রী বন্ধুর বিশেষ সহানুভূতি না পাইলে, আমি কি করিতাম, বলিতে পারি না। আট চল্লিশ ঘণ্টা পরে সমুদ্র স্থিরভাব ধারণ করিল। তখন আমার পীড়া যেরূপ হঠাৎ দেখা দিয়াছিল সেইরূপ হঠাৎ অন্তর্হিত হইল। আমার জীবনের এই ঘটনাটী স্মরণ করিলে আমি দুঃখের সময় অনেক সান্ত্বনা পাই। দুঃখভোগের সময় লোকে মনে করে, বুঝি কস্মিন্ কালেও অন্ত নাই এবং এইরূপ ভাবিয়া লোকে আত্মহত্যা করিতেও পশ্চাৎপদ হয় না। কবি ঠিক বলেন—"হতাশ হইয়া হঠাৎ কোনও কার্য্য করিও না, তুমি যে দিনকে বড়ই দুর্দ্দিন মনে করিতেছ, যদি তাহা কোনও প্রকারে কাটাইতে পার, তাহা হইলে দেখিবে তোমার আর দুর্দ্দিন নাই।" আমি এই উপদেশের সারবত্তা আমার নিজের জীবনে বার বার হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। এস্থলে আমার একজন বিভলভার-বিক্রেতার কথা মনে পড়িল। তিনি বলেন যে, যখন কোনও ব্যক্তি আত্মজিঘাংসু হইয়া তাঁহার দোকানে বিভলভার খরিদ করিতে আসে, তখন সে প্রায় উহার "কেস্" বা খাপ খরিদ করিত

চায় না—সে স্বকীয় অমূল্য জীবন নষ্ট করিতে প্রস্তুত, কিন্তু বৃথা খাপ কিনিয়া অর্থনষ্ট করিতে নারাজ। এরূপ স্থলে দোকানী ক্রেতার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া যেন অনবধানতা-প্রযুক্ত বিভলভারের মাপের অনুপযোগী কার্ট্রিজ বিক্রয় করেন এবং এই কৌশল অবলম্বনে তিনি অনেক আত্মহত্যা নিবারণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, ক্রেতা উপযুক্ত কার্ট্রিজের অভাবে একবার আত্মহত্যায় ভগ্নোদ্যম হইলে প্রায় দ্বিতীয়বার চেষ্টা করে না এবং কিছুদিন পরে তাঁহারই দোকান হইতে বিভল্‌ভারের মাপের কার্ট্রিজ ও কেস্ খরিদ করে।

একজন মানব-চরিত্রজ্ঞ বলেন, কোন ব্যক্তি আপনাকে যত সুখী বা দুঃখী মনে করে, সে বাস্তবিক তত সুখী বা দুঃখী নহে। আমরা যখন দুঃখের কথা ভাবি, তখন আমরা তৎসঙ্গে কত সান্ত্বনা উপভোগ করি, তাহা একবারও ভাবি না। মহাকবি সেক্সপীয়র বলেন, যদি দুঃখকে প্রথমেই দমন করিবার চেষ্টা না কর, তাহা হইলে উহা কোনও বিধি মানিবে না এবং কোনও সীমায় বদ্ধ থাকিবে না। দুঃখের সঙ্গে বিবাহ হইলে যখন বহু দিন কষ্টভোগ সুনিশ্চিত, তখন তৎপূর্ব্বে দুঃখকে প্রণয় সম্ভাষণে ডাকিয়া আনিবার কি প্রয়োজন? লোকে যখন কোনও নির্দ্দোষ আমোদ আহ্লাদে রত থাকে, আমরা তখন যেন নিজের দুঃখ স্মরণ করিয়া বিরস-বদন না হই। যদি আমরা পাছে অপরের সুখের হন্তারক হই, এই ভয়ে নিজের দুঃখ গোপন করি, তাহা হইলে উহার অনেক লাঘব ঘটে। বস্তুতঃ নিজের ভাগ্যে অধিক সুখ না ঘটিলেও যিনি সৌভাগ্যশালী বন্ধুবর্গের সুখে সুখী হন, তাঁহার কখনও সুখের অভাব হয় না। আমরা "সুখ" শব্দের সচরাচর যে অর্থ করি, তাহাতে সুখের সহিত আমাদের নিজের ঘনিষ্ঠ যোগ থাকা অত্যাবশ্যক মনে করি। যে সুখ আমরা নিজে সম্ভোগ করি, আমরা সুখ বলিলে তাহাই বুঝি। কিন্তু কিঞ্চিৎ ভাবিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, কাব্য, নাটক, নবন্যাসাদিতে বর্ণিত কল্পিত চরিত্রের সুখদুঃখের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না থাকিলেও, আমরা সহানুভূতির গুণে উহা সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব করিয়া লই। এইরূপ কাল্পনিক সুখদুঃখের সংযোগে আমাদের জীবনের সুখদুঃখের মূলধন কত বাড়িয়া যায়? একজন সুলেখক বলেন যে, এই জীবন-রূপ স্বপ্নে যদি আমরা বিশুদ্ধভাবে আমাদের কল্পনাবৃত্তির তুষ্টিসাধন করিতে পারি, তাহা হইলে আমরা যথার্থ জ্ঞানের পরিচয় দিব। বাস্তবিক কল্পনা যত সুখ প্রসব করে, তাহা যদি জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায়, তাহা হইলে জীবন অতি নীরস ও বিস্বাদ হইয়া পড়ে। যাহাকে আশা বলিয়া থাকি, তাহা কল্পনার মূর্ত্তিভেদ মাত্র। আশা না থাকিলে কে প্রাণে বাঁচিত? আহা! যে সুখ তাহাদের ভাগ্যে কখনও ঘটিবে না, তাহার আশায় কতলোক জীবনের শত সহস্র দুঃখ ভার নীরবে বহন করে। আশা গেলে তাহারা কি লইয়া থাকিবে?

অনেকের ধারণা যে, বিপুল অর্থোপার্জ্জন করিতে পারিলে জীবনের অনেক সুখ আয়ত্ত করা যায়। বর্ত্তমান সভ্য সমাজে অর্থাভাবে অশেষবিধ কষ্টভোগ করিতে হয়, ইহা কে অস্বীকার করিবে? এখন আর "বুনো রামনাথের" ন্যায় অন্নের অনন্যব্যঞ্জনভূত অর্দ্ধসিদ্ধ তেঁতুল পাতা ভক্ষণ করিয়া ন্যায়শাস্ত্রের অনুশীলন করা চলে না। এখন জীবনযাত্রা

নির্ব্বাহ করিতে গেলে পদে পদে অর্থের প্রয়োজন। এটী সভ্যতাবৃদ্ধির অবশ্যম্ভাবী ফল। যদি অর্থের সদ্ব্যবহার হয়, তাহা হইলে শঙ্করাচার্য্যের উপদেশ—"অর্থমনর্থং ভাবয়" ঠিক নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অর্থাগমের সঙ্গে সঙ্গে এত অনাবশ্যক অভাব দেখা দেয় যে, তাহা পূরণ করা ক্রমেই কঠিন হইয়া উঠে এবং এইরূপে দুঃখের বোঝা অকারণ বাড়িয়া যায়। লোকে যাহাতে সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে প্রথমে অর্থোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু শেষে অর্থোপার্জ্জন যে সুখ সাধনের একটী উপায় মাত্র, তাহা ভুলিয়া গিয়া অর্থকেই পরম পুরুষার্থ মনে করে এবং অর্থের জন্য এমন কষ্ট নাই, যাহা স্বীকার করিতে কাতর হয়, এমন কি, জীবনের মহত্ত্ব পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত হয় না। একজন চিন্তাশীল লেখক এই জন্যই বলেন যে, অর্থকে চিন্তা হইতে দূর করিলে চলিবে না, কিন্তু উহাকে হৃদয়ে স্থান দিবে না। শান্তি-কমলের বিমল জ্যোতির সহিত সোণা-রূপার চাকচিক্যের কি তুলনা হয়? অকিঞ্চিৎকর কাঞ্চনের বিনিময়ে যে আপনার অমূল্য জীবন বিক্রয় করে, সে কি ঘোর মূর্খ। কিন্তু অর্থের এমনি মোহকরী শক্তি যে, লক্ষ লক্ষ লোক প্রতিদিন এইরূপ নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দেয়। অর্থের প্রাচুর্য্যে বিলাসিতা বৃদ্ধি পাইয়া ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনকে অন্তঃসার-বিহীন ও মজ্জাহীন করিয়া ফেলে। বিলাসিতার প্রাদুর্ভাবে লোকে যে সকল অসার আমোদে রত হয়, তাহাতে হৃদয় কখনই তৃপ্তিলাভ করে না। ভাবুকশ্রেষ্ঠ রস্কিন্ বলেন যে, সমাজের মঙ্গলের জন্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ এরূপ লোকের প্রয়োজন, যাঁহারা অধিক অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টায় বিরত হইয়া সরল সুখে সুখী হইবার চেষ্টা করিবেন। এরূপ সুখ পারিবারিক জীবনে যেরূপ সুলভ, এমন আর কোথাও নহে। এসুখে, কি ধনী কি নির্ধন, সকলেরই সমান অধিকার। পারিবারিক জীবনে হৃদয়ের যে শিক্ষা হয়, সে শিক্ষা আর কোথাও হয় না। পারিবারিক সুখের ফল্গুনদী বাহিরের ঝড় ঝটিকায় বিচলিত না হইয়া নীরবে বহিতে থাকে। আমরা সুখের অন্বেষণে এদেশ সেদেশ ঘুরিয়া বেড়াই, কিন্তু প্রকৃত সুখ আমাদের মনে ও গৃহে।

"ঈশ্বর নিকটে, বনে অন্বেষণ করে।
কস্তুরী শিশু বিরাজিত ঘোষণা নগরে॥"

যদি বিশুদ্ধ সুখভোগ করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে নিজের বাসগৃহকে একটী পবিত্র, শান্তিময় দেব-মন্দিরে পরিণত কর। বাহিরের কোলাহল, বাহিরের অশান্তি, দৈনিক জীবন-সংগ্রাম-জনিত মলিনতা, দুর্ব্বলতা ও অনুদারতা যেন এই পুণ্যাশ্রমে কোনও ক্রমে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। এখানে প্রেম, পবিত্রতা ও শান্তি যেন অক্ষুণ্ণভাবে নিত্য বিরাজ করে। রক্তবীজ যেমন ধরাতল স্পর্শ করিলেই নূতন জীবন লাভ করিত, সেইরূপ, যিনি পারিবারিক সুখের এইরূপ দুর্ভেদ্য দুর্গে আশ্রয় লাভ করিতে পারেন, তিনি প্রাত্যহিক জীবন-সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হইলেও, অক্ষত শরীরে ও নব উদ্যমের সহিত রণক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ অবতীর্ণ হইতে সক্ষম হন। যে ব্যক্তি সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কাল্পনিক সুখের দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে আশ্রয় গ্রহণ করে, সে কিরূপে নিরাপদ হইবে? প্রকৃত দুঃখের আক্রমণে উহা এক নিমেষে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। কৃত্রিম উত্তাপে সম্বর্দ্ধিত উদ্ভিদ্ কি কখন বটবৃক্ষের ন্যায় প্রবল বাত্যাহত হইয়াও

অটল ভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে পারে? যে ব্যক্তি দুঃখকে আমল দিতে চায় না, সে কিরূপে প্রকৃতজ্ঞান ও বললাভ করিবে? বুলবুলের পিঞ্জর তমসাবৃত না করিলে যেমন উহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যায় না, সেইরূপ, দুঃখভোগ না করিলে মানব-হৃদয় হইতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীত উত্থিত হয় না। মহাকবি ডান্টে ও মিল্টনের জীবন-পথে যদি বিষাদের ছায়া না পড়িত, তাহা হইলে কি "ইন্‌ফার্ণো" ও "প্যারাডাইজ্‌ লষ্ট" রচিত হইত? মহাকবি গেটে বলেন—"হে ভগবান্! যে কখনও দুঃখের অন্ন খাই নাই, সে কিরূপে তোমাকে জানিবে?" গেটের জ্ঞানবল, ধনবল, সম্ভ্রমবল, কিছুরই অপ্রতুল ছিল না, কিন্তু তিনি অশীতিবৎসর বয়সে বলিয়াছিলেন যে, তিনি সমস্তজীবনে কয়েক সপ্তাহের অধিক কাল একাদিক্রমে সুখভোগ করেন নাই। যদি গেটের ভাগ্যে এত অল্প সুখ ঘটিয়াছিল, তবে আমরা কে যে দুঃখভোগে এত কাতর হই? জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ সক্রেটিস্ প্রশ্ন করিয়াছিলেন, যদি সমগ্র মানব-জাতির দুঃখ-সমষ্টিকে সমভাবে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তিকে একভাগ দেওয়া যায়, তাহা হইলে সে নিজের দুঃখের পরিবর্ত্তে ঐ ভাগ লইতে সম্মত হয় কি? অতি-বড় দুঃখীও এরূপ প্রস্তাবে সম্মত হয় কি না, সন্দেহ স্থল। কিন্তু চালনী দ্বারা যেমন শস্যের সারভাগ অসার ভাগ হইতে পৃথক্‌কৃত হয়, সেইরূপ বিপদাগমে মানব-চরিত্রের সারবত্তা পরীক্ষিত হয়। দুঃখ ভোগে মানব-হৃদয় যে অমূল্য শিক্ষা-লাভ করে এবং মানব চরিত্রে যে অপরিমেয় বলাধান হয়, তাহা যিনি হৃদয়ঙ্গম করেন, তিনি কুন্তীর ন্যায় ভাগ্যলক্ষ্মীর মন্দস্মিতাপেক্ষা তাঁহার ভ্রূকুটির সমধিক পক্ষপাতী হন। আমরা যখন নিজে দুঃখভোগ করি, তখন আমাদের সমদুঃখীকে অন্তরঙ্গ জ্ঞান করি। যদি এই তীব্র সাহানুভূতি স্থায়ী হয়, তাহা হইলে অশুভও কি শুভফল প্রসব করে। আমরা দুর্ব্বিষহ শোকে নিজে অশ্রুপাত না করিয়া যদি অপরের অশ্রুজল মুছাইয়া দিই, তাহা হইলে দারুণ শোক-শঙ্কুও কুশল দ্বারা উদ্ঘাটন করে।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ।

দাসীর স্নেহ।

নহি মাতা নহি কেহ, তবু ভালবাসি "খুকি"
লাবণ্য-লতিকা,
না জানি কন্যার স্নেহ, চিররুদ্ধ এ হৃদয়,
বিলোল বালিকা।
"মাসি" বলি কেড়ে নিলে, দরিদ্রের সমস্ত সম্বল,
একখানি মন,
প্রাণহীন দুর্ব্বাঘাস, বিশুষ্ক তুলসী তলে,
পাইল জীবন।
তাই এ আনন্দ-স্রোতে, ভাসাইল শুষ্কনদী-তীর
নিয়ে এল হাসি,
পুষ্পহীন, ফলহীন, আমি যে ঘৃণিত তরু,
ভাগ্যহীনা দাসী।
হও সুখী ভাগ্যবতী, কাড়ি লও "খগেন্দ্র-হৃদয়,
পাও ভালবাসা,
পূর্ণিমা রজনী সম, ছড়াও কিরণ, পূর্ণ হোক
বুকভরা আশা।

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

---

* জনৈক ভাগ্যহীনা বাল-বিধবা দাসীর প্রভু-কন্যার পরিণয় উপলক্ষে উক্তি।